জঙ্গম বাংলা

কেতকী কুশারী ডাইসন

প্রথমেই কবুল করি, প্রবন্ধরচনার জন্য আমাকে যে-কাঠামোটা পাঠানো হয়েছে, সেটা দেখে আমার খটকা লেগেছে। 'ভারতবর্ষের বাইরে বাংলা ভাষার অবস্থান, ভারতবর্ষের বাইরে বাংলা ভাষার প্রসারে নানা প্রতিকূলতা, প্রবাসী বাঙালিদের ভূমিকা...' ভারতবর্ষের বাইরে বাংলা-নামক ভাষার বৃহত্তম ঘাঁটি অবশ্যই বাংলাদেশে। প্রকৃতপক্ষে, ওখানকার বাঙালিরাই তো সংখ্যায় বিপুলতর। কেউ এমনও বলেন, আসল সাংস্কৃতিক সোনার বাংলা ওদিকেই, ভাষায়বা সাহিত্যে যা - কিছু ভালো কাজ তা নাকি আজকাল ওখানেই হয়, পশ্চিমবঙ্গের কর্মসূচি নাকি তার ধারে-কাছে াসে না। আমার নিজের অবশ্য ওরকম একপেশে মূল্যায়নকে নির্ভরযোগ্য ব'লে মনে হয় না, তবে সেইসব তর্ক বা ঝগড়াঝাঁটির মধ্যে যাওয়ার দরকার নেই। মনে হয়, ভারত আর বাংলাদেশ এই দুই এলাকার বাইরে যে- পৃথিবী, সেখানে বাংলার কী অবস্থান, সেখানে বাংলা প্রসারে প্রতিকূলতা কী, এবং তার প্রতিরোধে প্রবাসী বাঙালিদের উদ্যগ বা ভূমিকা কী--- এ ধরনের কথাই আপনারা শুনতে চেয়েছেন।

তবু ভিতরে - বাইরের প্রসঙ্গে কয়েকটি ধারণা পরিষ্কার ক'রে নিলে ক্ষতি নেই। অবস্থান একটি স্থানিক ধারণা। যাঁরা ভারতে (বা বাংলাদেশে) পাকাপাকিভাবে থাকবেন, তাঁদের অনেকের কাছে 'দেশ', 'বিদেশ', 'প্রবাসী' ইত্যাদি শব্দের সংজ্ঞাগুলো স্বচ্ছ, জ্বলজ্বলে, নিটোল, দৃঢ়রেখ, নির্দিষ্ট সীমারেখা দ্বারা চিহ্নিত, কাটা-কাটা। আমার মতো একজন মানুষের কাছে কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই ওরকম নয়। আমার কাছে শব্দগুলো ভীষণ পরস্পরে জড়ানো, একটা আরেকটাকে ছুঁয়ে আছে বা তার ভিতরে সেঁধিয়েই ব'সে আছে। অবস্থান কেবল শারীরিক নয়, মানসিক অবস্থান ব'লেও একটা জিনিস আছে। বাংলার দু'দিকেরসঙ্গেই আমি সম্পৃক্ত বোধ করি। আমার পারিবারিক শিকড়বাকড় পূর্ববঙ্গেই, আর আমি জন্মেছিলাম অবিভক্ত বঙ্গে, তাই পুরো অঞ্চলটাকেই আমি জন্মভূমি মনে করি। আমার প্রথম শৈশবের বেশ কয়েকটি বছর এমন কোনো জায়গায় অতিবাহিত হয়, সেগুলি এখন বাংলাদেশে, আর সেই বছরগুলি আমার মনে চিরস্থায়ী দাগ রেখে গেছে। তারপর আমি তৈরি হয়েছি পঞ্চাশের দশকের পশ্চিমবঙ্গে, এবং তারও পরে পাশ্চাত্য পৃথিবীতে। কিন্তু যেখানেই থাকি না কেন, আমার যাপিত জীবনের একটি সাধারণ সূত্র হলো বাংলা ভাষার প্রতি একটা দায়বদ্ধতা। ভারতীয় রাষ্টযন্ত্রের বিচারে আমি বর্তমানে 'বিদেশী', দমদমের বিমানবন্দরে নামতে হলে আজকাল আমার ভিসা লাগে, কিন্তু তাই ব'লে আমি কি কখনো কলকাতাকে 'বিদেশ' ভাবতে পারি ? পারি না। কলকাতা আমাকে যতই বিরক্ত বা উত্যক্ত কক, ওটা আমার আপন জায়গা। তেমনি কোথাও যদি পড়ি 'ফরিদপুরে এই ভয়ংকর ঘটনাটি', সঙ্গে সঙ্গে আমার মনের ভিতরকার কোনো একটা কোণ ব'লে বসে, দেখি দেখি, ফরিদপুরে কী হলো আবার, কে কাকে মারলো সেখানে, কেননা আমার স্মৃতি বলে ফরিদপুর ছিলো আমার মায়ের বাপের বাড়ির জেলা, যদিও মা নিজে অল্প বয়সে মাকে হারিয়ে মানুষ হয়েছিলেন জেঠার বাড়িতে বারানসীতে। তা হোক, আমার মাতামহের শিকড় যে-জেলায় সেটা আমার কাছে একে বারে বিদেশ হতে পারে না। জীবনানন্দের বরিশাল সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য। সে আমাদের অনেকেরই স্বদেশ -- গৌরবে বহুবচনের মতো গৌরবে স্বদেশ।

সেইভাবেই আমার শ্বশুরবাড়ির দেশ ব্রিটেনও আনেকদিন ধ'রেই আমার কাছে বৈদেশিকতা হারিয়েছে, হয়ে উঠেছে নিজের দেশ। যখন ১৯৬০ সালে এখানে প্রথম পড়াশোনা করতে এসেছিলাম, তখন দেশটা বিদেশ ছিলো এমন বলা যেতে পারে । কিন্তু বিয়ের পর ১৯৬৪ সালে দ্বিতীয়বার যখন এখানে এলাম, তার পরও প্রায় চার দশক কেটে গেছে। এতগুলি বছরের চেনাজানার পরে কোনো দেশ কি আর বিদেশ থাকে? এখানে আমি শিকড় গেড়েছি, একটি দিশি পরিবারের সঙ্গে নিজের পরিচয়কে মিশিয়েছি, আমার সন্তানদের মানুষ করেছি। সেই সূত্রে এ দেশের জায়া - জননীদের সঙ্গে আত্মীয়তা অনুভব করেছি, ইংরেজিতে কবিতা লেখা এবং কবিতার ওয়ার্কশপ করা আরম্ভ করেছি। আসলে দীর্ঘকালীন অভিবাসী জীবনের পর একটা মানসিক অবস্থান গ'ড়ে ওঠে, যেটা একটা লম্বা টানটান তারের মতো। সেই তারের এক প্রান্তে থাকে আদি দেশ, অন্য প্রান্তে নতুন দেশ। সেই টেনশনের মধ্যেই আমাদের জীবন একটা রূপ, একটা ছন্দ, একটা ভাষা খুঁজে প ায়। আমার ক্ষেত্রে আদি দেশটি আবার টুকরো-টুকরো হয়ে ভেঙে গেছে। এতে তারের টেনশন কমে না, বরং বাড়ে। ঢাক া-ফরিদপুর কেন, আমি তো শত চেষ্টা ক'রেও লাহোর বা করাচিকেও 'বিদেশ' ভাবতে পারি না। অবশ্য ভুল জায়গায় এ ধরনের কথা বললে উল্টো ফল হবার সম্ভাবনা। হয়তো কেউ ভেবে বসবেন এর মধ্যে ক্ষুদ্র প্রতিবেশীর প্রতি বৃহৎ প্রতিবেশীর দৃষ্টিভঙ্গি, ক্ষুদ্রকে গিলে খাবার অজগর - বাসনা প্রকাশ পাচ্ছে। কিন্তু হয়তো কিছু কিছু মানুষ থাকে, অন্যদের সঙ্গে আত্মীয়তা অনুভব করার ব্যাপারটা যাদের সহজে আসে, তথাকথিত বিজাতীয়দের স্বজাতীয় ভাবতে যাদের তেমন কোনো অসুবিধা হয় না। অন্যদের সাধারণ মনুষ্যত্বটাই এদের সবার আগে নজরে পড়ে, চেনা দল থেকে অচেনাদের বাদ দেওয়ার চাইতে দলের ভেতরে নতুন লোকঢোকানোতেই এদের আগ্রহ বেশি। হয়তো আমি তেমন জাতের লোক, তাই তথাকথিত বিদেশে শিকড় গাড়তে পেরেছি। আমার বেশ মনে আছে, ওকাম্পোর ওপরে কাজের সূত্রে যখন বুয়েনোসঅ াইরেসে গিয়েছিলাম, ওখানকার বাস বা পাতাল রেলে যাত্রা করার সময়ে সহযাত্রীদের মুখের দিকে চেয়ে থাকতাম ম ানুষগুলোর মুখচোখের ভাষা আমার কাছে কখনোই অচেনা ঠেকতো না। অনেক সময় রাত ক'রে বাড়ি ফিরতাম, কিন্তু কখনো ভয় করতো না।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে, বিশেষত গত-পঁচিশ - তিরিশ বছরে উপমহাদেশের জমির বাইরে একটি বৃহৎ বাঙালি সমাজ গ'ড়ে উঠেছে। আগেকার দিনে এঁদের সকলকেই ঢালাওভাবে 'প্রবাসী বাঙালি' বলা হতো। এমন কি, যেসব বাঙালি ভ ারতের ভিতরেই বাংলাভাষী এলাকার বাইরে বসবাস করতেন, তাঁদেরও 'প্রবাসী বাঙালি' বলা হতো, হয়তো এখনও হয়। কিন্তু আজকের দিনের ব্যাপক 'ডায়াস্পোরা' অর্থাৎ ছড়িয়ে পড়ার পরিপ্রেক্ষিতে 'প্রবাসী' শব্দটা আর ঠিক যথেষ্ট নয়। 'প্রবাসী' শব্দটা দ্বারা কেবল জন্মভূমির বাইরে থাকার ব্যাপারটুকু সূচিত হয়। কিন্তু ইউরোপে আমেরিকায় অস্ট্রেলিয় ায় 'ছড়িয়ে পড়া' আজকের দিনের 'ডায়াস্পোরিক' বাঙালিরা অনেক সময়েই নতুন দেশগুলোরস্থায়ী বাসিন্দা, প্রায়ই সেসব দেশের নাগরিক। এঁরা মাইগ্রান্ট বা অভিবাসী, এবং প্রকৃত প্রস্থাবে নতুন দেশগুলোর সংখ্যালঘুদের দলে। নতুন দেশের সংখ্যালঘু গোষ্ঠী হিসেবে নিজেদের জন্য দাবিদাওয়া আদায় করতে হয় এঁদের। এঁদের সন্তানরা নতুন দেশেই বড় হয়ে ওঠে, তাই সেই দ্বিতীয় প্রজন্ম সম্পর্কে 'মাইগ্রান্ট', 'অভিবাসী', 'দেশান্তরিত'ইত্যাদি বিশেষণও আসলে উপযুক্ত নয়। এই দ্বিতীয় প্রজন্ম তাদের রক্তের বাঙালিয়ানাকে সাধারণত অস্বীকার করেনা, কিন্তু সংস্কৃতির ব্যাপারে তাদের জীবনের নান ারকমের দ্বন্দ্ব আপনা থেকেই এসে যায়। বাবা- মায়ের আদি দেশ, যেটা তাদের নিজেদের বড় হয়ে ওঠার দেশ, দুই দেশের সংস্কৃতির মধ্যে সমন্বয়সাধনের তাগিদ তাদের জীবনে অনেক সময়ে অনেক সমস্যা, অনেক সংশয় সৃষ্টি করে, অনেক প্রশ্ন চাগিয়ে তোলে। কোন্ দিক থেকে কতটা নেবে, সমন্বয়ের সাধনা আদৌ না ক'রে আপস করবে কিনা, সংখ্যাগরিষ্ঠদের সংস্কৃতির সঙ্গে নিজেদের একেবারে একাত্ম করেফেলবে কিনা, এইসব প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই তাদের বিক্ষুব্ধ করে। ভাষার প্রশ্ন া এই জটের মধ্যেই এসে যায়।

আত্মচেতনার সূত্রে ডায়াস্পোরার বাঙালিদের সম্বন্ধে আমি ভাবছি আনেকদিন ধ'রেই, কিছু কিছু ছবি উপন্যাসে নাটকে ধরিয়েও দিচ্ছি। সাহিত্যের প্রসঙ্গে ব্যাপারটা নিয়ে প্রবন্ধধর্মী রচনায় আলোচনা ক'রে যাচ্ছি তাও অনেক দিন হলো। ''একজন অভিবাসী কবির জীবন কিছু 'ব্যক্তিগত কথা' '' এই শিরোনামে আমার একটি প্রবন্ধপ্রকাশিত হয়েছিল 'কোরক'

পত্রিকার শারদীয় ১৯৯৬ সংখ্যায়। 'এবং মুশায়েরা' পত্রিকার একটি বিশেষ সংখ্যাতেও (৪ ৪, জানুয়ারি-মার্চ ১৯৯৮) নিজের কাজের সূত্র ধ'রে এই প্রসঙ্গে কিছু ভাবনা গ্রথিত হয়েছিলো। একটু বড় পরিসরে গুছিয়ে ভাবতে হয়েছিলো যখন ১৯৯৯ -এর জুন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আর্ভিং টেক্সাসে একটি সম্মেলনে বক্তৃতা দিতে হয়েছিলো। এছাড়া ডায়াস্পোরার বাঙালি সাহিত্যিকদের এক-একজনকে নিয়ে তাঁদের কাজের সমালোচনা ও মূল্যায়ন কিভাবে করতে হবে সে বিষয়েও আমি পথিকৃতের ভূমিকা কিছুটা পালন করেছি এমন দাবি করত পারি। এভাবেআলোচনা করেছি লোকনাথ ভট্টাচার্য, দিলারা হাশেম, আলম খোরশেদের কাজের। এই লেখাগুলি বেরিয়েছে ১৯৯৯ এবং ২০০২ সালের ভিতরে 'এবং মুশায়েরা', 'দেশ' এবং 'জিজ্ঞাসা'র বিভিন্ন সংখ্যায়। এই এলাকায় আমার সর্বশেষ প্রবন্ধ হচ্ছে ক্যানাডার দ্বৈভাষিক পত্রিকা 'বাংলা জার্নাল'-এ প্রকাশিত 'দেশ আর বিদেশ বাংলা ডায়াস্পোরার কয়েকজন সাহিত্যিক' ('বাংলা জর্নাল', বৈশাখ-ভাদ্র ১৪০৯, ৪র্থ বর্ষ, ১ম-২য় সংখ্যা, এপ্রিল-অগাস্ট ২০০২)। এই সুদীর্ঘ প্রবন্ধেসর্বসমেত আটজন অভিবাসী সাহিত্যিকের কাজ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। সেই আটজন হলেন সৌম্য দাশগুপ্ত, ইউসুফ রেজা, তাপস গায়েন, শিবলি সাদিক, ফরিদা মাজিদ, সালেহা চৌধুরী, দিলারা হাশেম এবং তসলিমা নাসরিন। আটজনের মধ্যে সাতজনেরই শিকড়বাকড় বাংলাদেশে। দিলারার উপন্যাস 'হামেলা' আর তসলিমাব উপন্যাস 'ফরাসি প্রেমিক'-এর যে-তুলনামুলক আলোচনা ওখানে করছি, সেখানে পাঠকরা চিন্তার খোরাক পাবেন ব'লে আমার বিশ্বাস।

বাংলা ডায়াস্পোরার সাহিত্যিকদের নিয়ে মাথা ঘামিয়েছি এই কারণেই যে মূলধারার মাধ্যমে আমাদের বইয়ের দু'চারটা ভালো রিভিউ মাঝে-মধ্যে বেরোলেও ডায়াস্পোরার ব্যাপক প্রেক্ষাপটে আমাদের কাজের অর্থবহ সুবিন্যস্ত আলোচনা দেখতে পাই না। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে যাঁরা গবেষণা করেন, তাঁদের দৃষ্টিতে ডায়াস্পোর একটা চালচিত্রথাকে বটে, কিন্তু সেটা একান্তভাবে ইংরেজিভিত্তিক। ভারতীয় ডায়াস্পোরার ইংরেজি ভাষায় লেখকদের নিয়েই তাঁরা ব্যস্ত থাকেন, আমাদের দিকে তাকাবার মর্জি বা ফুরসত তাঁদের একেবারেই নেই। আমার তাই মনে হয়েছে যে বাংলা ডায়াস্পোরার সাহিত্যিকদের নিয়ে ডিটেলসমন্বিত প্রাজ্ঞ আলোচনার সূত্রপাত আমাদের নিজেদেরই করতে হবে।
অভিবাসী জীবনে বাংলার সঙ্গে আমার যোগ প্রধানত লেখার (এবং অবশ্যই পড়ার) মাধ্যমে। আমি এ প্রবন্ধে কথা বলতে পারি কেবল একজন অভিবাসী লেখিকা হিসেবে এবং নিজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। নিজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কথা বলা যদি ত্রুটি হয়, পাঠককে তা মার্জনা করতে হবে। আমি নিপায় ; বৃহৎ পৃথিবীতে বাংলার প্রসার নিয়ে আমি তো সত্যিই কোনো নিয়মমাফিক সমীক্ষণ বা গবেষণাকর্ম করি নি। বিষয়টা বিরাট, গবেষণার উপযুক্ত বিশাল ক্ষেত্র এখানে রয়েছে। প্রসঙ্গত বলি, প্রবন্ধ রচনার জন্য যেসব অনুরোধ সম্পাদকদের কাছ থেকে আসে, সেগুলোতে এক -একসময় আমার বুক কাঁপে, গায়ে জ্বর আসে ; মনে প'ড়ে যায় স্কুলজীবনের কথা, যখন শিক্ষিকারা অমুক বা তমুক বিষয়ে প্রবন্ধ লিখে আনতে আদেশ করতেন। দেখতে পাই সেকালের শিক্ষকদের মতো একালের সম্পাদকরাও কর্মকুশল সর্বজ্ঞতা প্রত্যাশা করেন।

লেখার জগৎটার বাইরে আমি যা-কিছু প্রতিবেদন রাখতে পারি তা নেহাৎ ইম্প্রেশনভিত্তিক। যাঁরা স্কুলে অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিষয় হিসাবে বাংলা পড়ান, তাঁদের কাছে খোঁজ নিলে আপনারা আরও অনেক বিশদভাবে জানতে পারবেন বাংলা ভাষার প্রসার এখানকার জীবনের তৃণমূলে (অথবা গজদন্তমিনারে) ঠিক কতটা ঘটছে । প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় পর্যন্ত বাংলা শেখানোর ব্যবস্থা ব্রিটেনের কিছু স্কুলে আছে। প্রয়াত অধ্যাপক বিমলকৃষ্ণ মতিলালের স্ত্রী করবী মতিলাল বর্তমানে কলকাতাতেই প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদানে আত্মনিয়োগ করেছেন, কিন্তু তিনি এক সময়ে অক্সফোর্ডের স্কুলে বাংলা পড়াতেন। লন্ডনে তুলনীয় কাজ করেন লেখক ও গবেষক গোলাম মুরশিদ, ভারতীয় বিদ্যাভবন-নামক শিক্ষায়তনের সঙ্গে যুক্ত থেকে অনুরূপ কাজ করেন নমিতা আচার্য আমি যতদূর, জানি, ব্রিটেনে বিশ্ববিদ্যালয়-স্তরে যথাযথ অর্থে বাংলা বিভাগ একমাত্র লন্ডনেই আছে, এবং সেখানে অধ্যাপনা করেন উইলিয়াম র‍্যাডিচি। তাঁর আয়োজিত অনুবাদবিষয়ক একটি ওয়ার্কশপে গত বছর অংশগ্রহণ করেছিলাম। পৃথিবীর আরও কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার পঠনপাঠনের ব্যবস্থা আছে শুনেছি, কিন্তু এ-জাতীয় কোনো শিবিরেরই আন্দরমহলের সঙ্গে আমার যেহেতু যোগ নেই, তাই তাদের ভিতরকার কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে ডিটেলে কিছুই বলতে পারবো না। বৃহৎ বিশ্ববাংলার প্রসার ও প্রচার সম্পর্কে এইসব গোষ্ঠীর কোনো কর্মসূচি অ

াছে কিনা সেটা তাঁরাই বলতে পারবেন। বাংলা শিখেছেন এমন দু'চারজন ব্রতাঙ্গকে ব্যক্তিগতভাবে অবশ্যই চিনি। তবে রবীন্দ্রনাথকে মূল বাংলায় পড়তে পারেন এমন কোনো স্প্যানিশভাষীর দেখা আজও না পেয়ে আমি খানিক হতাশ! হোসে পাস্ নামে স্পেনের গালিসিয়া অঞ্চলের এক গবেষক বাংলা শেখা আরম্ভ করেছিলেন, কতদূর এগিয়েছেন জানি না। অ াশা করি চেষ্টা ছেড়ে দেন নি! এই মানুষটি খুবই রবীন্দ্রভক্ত ; তাঁর জন্মের শহরে রবীন্দ্রসংক্রান্ত একটি গ্রন্থসংগ্রহ গ'ড়ে তে ালার চেষ্টাকরেছেন। এঁর মাতৃভাষা আসলে গালিসিয়ান পোর্তুগীজ, এবং ইনি দাবি করেন যে সেই ভাষায় মূল বাংলা থেকে রবীন্দ্রনাথের কিছু অনুবাদ হয়েছে। স্প্যানিশে যেসব অনুবাদ হয়েছে সেগুলি ইংরেজির মধ্যস্থতায়।

অ্যাকাডেমিক জগৎটার সঙ্গে আমার আদাপ্রদান খুব সীমাবদ্ধ। আধুনিক অধ্যাপকরা সাধরণত কেরিয়রমুখো, কেরিয়রে উন্নতি তাঁদের অভিনিবেশের ফোকস্। আড়চোখে তাকিয়ে যেটুকু দেখেছি তাতে মনে হয় তাঁদের মনোভাবের মধ্যে একটা ব্রাহ্মণত্বের অহংকার আছে। বাংলার বাইরে অনেকেই যদি বাংলা শিখে ফেলে এবং তার চর্চা করে, তা হলে তাঁদের, অর্থ াৎ যবন পণ্ডিতদের, বিশেষজ্ঞতার দাম ক'মে যায় না ? ভাতও মারা যায় বোধ হয় ! তাই বাংলার ব্যাপক চর্চা বা প্রসার তাঁদের এজেন্ডা না-ও হতে পারে! একটি ছোট তথ্য তুলে ধরি। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আমার তিনটি পৃথক খাতে কাজ অ াছে--- কবিতার অনুবাদ, রবীন্দ্র-ওকাম্পো-সংক্রান্ত গবেষণা, রবীন্দ্রনাথের বর্ণদৃষ্টি সম্পর্কেগবেষণা--- এবং মোট চারটি প্রকাশিত বই, তা ছাড়া কিছু প্রবন্ধও আছে। আমি কিন্তু তাঁকে নিয়ে কোনো পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু বলতে, কোনো সেমিনার দিতে কখনোই আহূত হই নি। এই ছোট্ট তথ্যটি কি আমাদের কিছুবলে? আশা করি বাঙালি পাঠক আবার এই কথাটার মধ্যে আমার অভিমান খুঁজে পাবেন না। সত্যভাষণের কিছু অসুবিধাজনক দিক আছে। আমি শুধু একটা তথ্য সরবরাহ করলাম। আগেই বলেছি আমি কেবল নিজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কথা বলতে পারি।

বাঙালিদের ঢেউ পৃথিবীময় আছড়ে পড়ার সাথে সাথে নতুন দেশগুলিতে তাদের একটা সাংস্কৃতিক জীবন গ'ড়ে উঠেছে। ত াকে বলা যায় 'অভিবাসী বাংলা সংস্কৃতি'র তৃণমূল। বাঙালিরা যেখানেই আস্তানা গাড়ে, সেখানেই তাদের খাওয়াদাওয়া, নাচগান, ক্ষুদ্র পত্রিকা প্রকাশ, আবৃত্তি- অভিনয় ইত্যাদির মাধ্যমে নিজেদের বাঙালিয়ানা বজায় রাখার একটা চেষ্টা করে। ব্রিটেন এ ব্যাপারে ব্যতিক্রম নয়। এখানকার বড় বা মাঝারি মাপের জনপদে লন্ডন বার্মিংহ্যাম ম্যানচেস্টার লিভারপুল লীড্স্ শেফিল্ড সানারল্যান্ডগ্লাসগো এডিনবরা সোয়ানসি কার্ডিফ ইত্যাদি শহরে-- দুই বাংলার বাঙালিদের নানবিধ স াংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপের স্রোত বয়। পুজো-ঈদ, পয়লা বৈশাখ, পঁচিশে বৈশাখ, একুশে ফেব্রুয়ারি, নজল - স্মৃতি ইত্যাদি উপলক্ষ্যে একটা না একটা অনুষ্ঠান লেগেই থাকে। লন্ডনের ভারতীয় বিদ্যাভবনেনমিতা আচার্য অথবা শ্যামলী বসুর অ ায়োজনে, ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে যুক্ত নেহ সেন্টারে, বার্মিংহ্যামে পিয়ালী রায়ের 'সম্পদ' সংস্থার প্রযোজনায় 'ম্যাক' প্রেক্ষাগৃহে একাধিক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান দেখেছি, যেখানে বাংলা শোনাগেছে। লন্ডনের টাগোর সেন্টার রবীন্দ্রপ্রচারে নিবেদিত একটি উদ্যোগী প্রতিষ্ঠান। এর প্রধান কাণ্ডারী কল্যাণ কুণ্ডু,বর্তমানে সঙ্গে আছেন অমলেন্দু বিশ্বাস। এঁরা রবীন্দ্রবিষয়ক গ্রন্থসংগ্রহ তৈরি করেছেন, কিছু বই প্রকাশ করেছেন, ব্রিটিশপত্রপত্রিকায় রবীন্দ্রপ্রসঙ্গে প্রদর্শনী করেছেন--- এ বিষয়ে কল্য াণবাবুর ইংরেজিতে তথা বাংলায় বই রয়েছে। এঁরাও কিছু কিছু অনুষ্ঠান ও আলোচনা-সভার আয়োজন ক'রে থাকেন। এঁদের আয়োজিত নৃত্যগীতের আসরেও বাংলা শ্রুতিগোচর হয়, তবে আলোচনার আসরে মাধ্যম হিসেবে ইংরেজিই ব্যবহৃত হতে দেখেছি, যেহেতু এঁদের লক্ষ্য ঠিক বাংলার প্রসার নয়, রবীন্দ্রনাথেরই প্রচার, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে খবরাখবর জিজ্ঞাসুদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া। সেইফাঁকে বাংলা সম্বন্ধেচেতনাও ছড়ায়। ২০০০ সালে তাঁরা একটি বড় আন্তর্জাতিক আলোচনা - সভার আয়োজন করেছিলেন। গালিসিয়ার রবীন্দ্রভক্ত হোসে পাস্-এর সঙ্গে আমার সেখানেই প্রথম দেখা। ২০০২-এ টাগোর সেন্টারেরগ্লাসগো শাখায় একটি সুন্দর অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলাম। ইংরেজিতেই বলেছিলাম। ফরাসি দেশ থেকে শর্মিলারায়ও সেখানে অংশগ্রহণ করতে এসেছিলেন। শুনেছিলাম যে শ্রোতাদের মধ্যে যাঁরা ছিলেন স্থ ানীয় স্কটিশ মানুষ, তাঁরা অনুষ্ঠান দেখে-শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন, এবং এ কথাও নাকি বলেছিলেন, ব্রিটেনের লংখ্যালঘু গো ষ্ঠীগুলির মধ্যে বাঙালিদের একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে, তারা তাদের কালচারকে সত্যিই ভালোবাসে, এবং তাদের মধ্যে যে একটা ভাবনাগত এবং নান্দনিক সূক্ষ্মতা আছে তা বুঝতে পারা যায়। টাগোর সেন্টারের একটি জুনিয়র বিভাগও

আছে, যেখানে তণ প্রজন্ম অংশগ্রহণ করতে পারে। তাদের সাম্প্রতিকতম খবর এই যে তারা একজন বাঙালি নৃত্যশিল্পীর তত্ত্বাবধানে নাচ আর অভিনয়ের মাধমে 'ক্যামেলিয়া' কবিতাটিকে মঞ্চপ দেবার চেষ্টা করছে।অবশ্য ওরা সেই মঞ্চায়নে ইংরেজিই ব্যবহার করবে ঠিক করেছে। এবং জানা গেলো অধমের করা তর্জমাটি তাদের প্রেরণা যোগাচ্ছে। এ সমস্তই প্রসংশনীয় উদ্যম।

এ দেশে কেউ কেউ বাংলা ভাষার মাধ্যমে সাংবাদিকতা করেন, কেউ কেউ বাংলায় বই লেখেন, বা বাংলা-ইংরেজি মিলিয়ে দ্বৈভাষিক পুস্তিকা প্রকাশ করেন, কেউ কেউ রবীন্দ্রংগীতের চর্চা করেন। সুগায়িকা ও সংগীতবিশেষজ্ঞ অনুরাধা পালচৌধুরী থাকেন কার্ডিফে, কিন্তু আমি তাঁর গান শুনেছি করবী মতিলালের অক্সফোর্ডের বাড়িতে। গুণী গীতিকার ও গায়িকা আমার বিশেষ স্নেহভাজন মোসুমী ভৌমিক কয়েক বছর ধ'রে স্বামীর কর্মসূত্রে ব্রিটেনপ্রবাসী। লন্ডেনে তাঁর গোটা তিনেক অনুষ্ঠান গুনেছি। তাঁর মধুক্ষরা উড়ন্ত কণ্ঠস্বরে সাদা-কালো সব মানুষেরই মন মজে; তাছাড়া তাঁর ভাবনায় স্বাতন্ত্র্য, তাঁর সমাজচেতনাও শ্রোতাদের মনে গভীরভাবে দাগ কেটে যায়। সম্প্রতি ইরাকেরযুদ্ধের বিদ্ধে প্রতিবাদ একটি অসাধারণ একক অনুষ্ঠান করলেন তিনি ; যা আরও উল্লেখযোগ্য, আরেকটি প্রতিবাদী মিশ্র অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করলেন, যেখানে ছিলো প্রচণ্ডরকমের উচচানিনাদিত রক্ মিউজিকও, এবং সেই রক্-এর শ্রোতাদের বিলকুল বশ ক'রে ফেললেন তঁার বাংলা শান্তির গানের জাদু দিয়ে--- পানীয়ের পাত্র হাতে মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনলেন তাঁরা।

সাধারণত নৃত্যগীত আর অভিনয়ের চাহিদাই সব থেকে বেশি। দুই বাংলা থেকে পারফর্মারদের আনানো হয়। স্থানীয় অভিনয়ের দলও কয়েকটি আছে। প্রহসন ঘেঁষা পালাই তাঁদের বেশি পছন্দ, তবে একটু অন্য ধরনের জিনিসও একেবারে বরবাদ নয়। ভারতীয় বিদ্যাভবনে নমিতা আচার্যর পরিচালনায় 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা'র যে-প্রযোজনা দেখেছি, তা কলকাতাতেও সসম্মানে পরিবেশিত হতে পারতো। বাংলা সিনেমার উৎসাহীরাও আছেন; তাঁদের প্রচেষ্টায় কখনও কখনও লন্ডনের প্রেক্ষাগৃহে সত্যজিৎ রায় বা ঋত্বিক ঘটক বা তারেক মাসুদের ফিল্ম দেখার সুযোগ মিলে যায়।রেডিং শহরের অন্ধতী রায় অভিনয় এতই ভালোবাসেন যে তিনি এই সম্প্রতি কলকাতায় গিয়ে রবীন্দ্রনাথের একটি ছোটগল্প অবলম্বনে আস্ত ফিল্ম বানিয়ে এনেছেন। যাঁরা বাংলা থেকেই ইংরেজিতে উচচপর্যায়ের অনুবাদ করেন, তাঁদের দল সাম্প্রতিক কালে ভারী হয়েছে লন্ডনে গোপা মজুমদারের উপস্থিতিতে। ইনি আগে দিল্লিতে থাকতেন, লব্ধপ্রতিষ্ঠ অনুবাদক হিসেবে ভারতে সুপরিচিতা।

প্রশ্ন তোলা যেতে পারে, এইসব সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের ফলে ব্রিটেনে বাংলা-নামক ভাষাটির অবস্থানের কি কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হচ্ছে? তার মর্যাদা কি বাড়ছে? কমিয়ে বললেও বলতেই হয়, বাংলা-নামক ভাষাটার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিছু চেতনা তো সাধারণ্যে ছড়াচ্ছে। এ দেশে প্রথম যখন এসেছিলাম, সেই সময়টার কথা যখন ভাবি, আর এখনকার অবস্থার সঙ্গে যখন তুলনা করি, তখন আমাকে মানতেই হয় যে এ দেশের সাংস্কৃতিক রাজনীতিতে একটা হাওয়াবদল ঘ'টে গেছে। প্রথম যখন এসেছি, তার মাত্র তেরো বছর আগে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য তার 'মুকুটের মণি' ভারতবর্ষকে খুইয়েছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের 'কোলোনিয়াল' ব্রিটেনকে তখনও হাত দিয়ে ছোঁয়া যায়। কিন্তু তার পরে এখানকার সমাজ অনেক ভাঙাগাড়ার মধ্য দিয়ে গিয়েছে। সাম্রাজ্য - অবসানে অথচ তার সূত্র ধ'রে এ দেশে যে নানা সংস্কৃতির স্ত্রীপুষ শিকড় গেড়েছেন, নানা ভাষাভাষী মানুষ স্থায়ীভাবে বসবাস করেছেন, তাঁদের শ্রম ও সেবা যে ব্রিটেনের অর্থনীতিকে অপরিহার্য মদত যোগাচ্ছে, এটা তো অস্বীকার করবার জো নেই। এশিয়ার ডাক্তার-নার্সদের সেবা সরিয়ে নিলে ব্রিটেনের ন্যাশনাল হেল্থ সার্ভিস ধবসে পড়বে; ক্যারিবীয় গোষ্ঠীর শ্রম বাদ দিলে লন্ডনের পাতাল রেলবন্ধ ক'রে দিতে হবে। ডাকবিভাগ, দোকানপাট, হাটবাজার, বিদ্যালয়, সরকারী দপ্তর, সহস্রবাহু আমলাতন্ত্র, গণমাধ্যম, বিনোদন, ব্যবসাবাণিজ্য--- সর্বত্র অভিবাসীদের শ্রম এ দেশের জীবনযাত্রার কলকব্জাকে তৈলাক্ত রাখছে।পূর্বআফ্রিকা থেকে আগত এশীয় রক্তের মানুষরা তাঁদের ব্যবসাবাণিজ্যের চাকচিক্য দিয়ে এক-একটি পড়তি শহরের ভোল পাল্টে দিয়েছেন। আগন্তুক গোষ্ঠীগুলির মেজাজশরিফ রাখতে না পারলে এই 'পোস্টকোলোনিয়াল' আমলে মুখ্য রাজনৈতিক দলগুলিই কি ভোট পাবে ? গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংখ্যালঘুরা সর্বত্রই

গুত্বপূর্ণ ভোট ব্যাংক। তাদের খুশি রাখার একটা ন্যূনতম চেষ্টা না করলে আত্মসম্মানযুক্ত পার্টিগুলো আজকের জলব ায়ুতে টিকতেই পারবে না।
সমাজের এই অব্যাহত গণতান্ত্রিকীকরণ- প্রক্রিয়ার সূত্র মাল্টিকালচারালিজ্‌ম্‌ অথবা বহুসাংস্কৃতিকতার একটা পরিমণ্ডল গ'ড়ে উঠেছে, এবং সেই পরিমণ্ডলে সংখ্যালঘুদের ভাষাগুলি একটা নতুন গুত্ব পাচ্ছে। সংখ্যালঘুদের সাংস্কৃতিক ক্রিয় াকলাপের জন্য, তাদের ভাষাগুলির জন্য কিছু অর্থসাহায্য মেলে, কিংবা সরাসরি অর্থসাহায্য না পেলেও নিদেনপক্ষে সেই 'সাংস্কৃতিক স্পেস' আজকাল পাওয়া যাচ্ছে, যা ষাট অথবা সত্তরের দশকে অকল্পনীয় ছিলো।

আমি প্রথম যখন অক্সফোর্ডে পড়াশোনা করতে এসেছিলাম, আমাকে কেউ কেউ প্রশ্ন করতেন, আমার ইংরেজিটা এত উৎকৃষ্ট, আমি নিশ্চয়ই আমার পৈতৃক গৃহে ইংরেজিতে কথা বলি? শুনলে আমার মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে যেতো, এবং আ মি জোর দিয়ে বলতাম, কখনোই না, বাড়িতে আমি মাতৃভাষায় কথা বলি, এবং সেই ভাষাটি হলো বাংলা।তা হলে অত শুদ্ধ ইংরেজি বলি কী ক'রে ? কারণ যত্ন ক'রে শিখেছি, স্কুল-কলেজে তার পিছনে শ্রম আর সময় দিয়েছি। শ্রম আর সময় দিলে একাধিক ভাষা অবশ্যই আয়ত্ত করা যায়।

এখন আর কেউ ঠিক ঐ ধরনের প্রশ্ন করবেন না। ব্রিটেন যে এখন বহুভাষাভাষী দেশ, অবস্থাগতিকে অনেকে সে-তথ্য মানতে আরম্ভ করেছেন।মহানগর লণ্ডনের স্কুলে যেসব ছেলেমেয়েরা পড়ে, হিসেব বলে তাদের মুখে মুখে নাকি তিনশতাধিক ভাষা ও উপভাষা প্রচলিত। দিনের কোনো না কোনো সময়ে ঐসব মাতৃভাষা তাদের মুখে রণিত হয়। বাকি সময়ে সেই উত্তরা ধিকার একটা প্রভাব রাখবেই। যাঁরা স্কুলে পড়ান, বিশেষত যাঁরা ছোট ছেলেমেয়েদের পড়ান, সেইসব শিক্ষকশিক্ষিকাদের এই অবস্থার সঙ্গে সমঝোতা না করলে নয়। চাবুক মেরে কোনো কিছু শেখানো এ দেশের সরকারি স্কুলগুলোর আওতায় সম্ভব নয়। কিছু শেখাতে হলে, তা ইংরেজিই হোক, কি অঙ্ক, গায়ে হাত বুলিয়ে 'বাবা বাছা' ব'লেই শেখাতে হবে। সরকা রি স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মনোভাবে গণতান্ত্রিকীকরণ তাই সংস্কৃতির অন্যান্য কর্ণধারদের থেকে আগে হয়েছে। একটু আগে উল্লেখ করেছিলাম যে শ্রীমতী কবীর মতিলাল অক্সফোর্ডের স্কুলে বাংলা পড়িয়েছেন এককালে। আমার দুই ছেলে পড়াশোনা করেছিলো কিডলিংটনের সরকারি স্কুলে ; দুর্ভাগ্যক্রমে সেখানে এবং সে-সময়ে ওরকম কোনো ব্যবস্থাই বহাল ছিলো না। তা হলে ওদের বাংলার চর্চাটা ঠিকমত বজায় রাখা যেতো। দুর্গাপুরের স্কুলে এক বছর পড়িয়ে ওদের যখন ফেরত এনেছিলাম, তখন ওদের মৌখিক বাংলাটা বেশ ভালোই ছিলো, কিন্তু সেই সত্তরের দশকে বিলেতের বিদ্য ালয়গুলিতে বহুসাংস্কৃতিকতার দর্শন ঠিক ক'রে ঢোকে নি। বাংলার জন্য কোনো আলাদা ব্যবস্থা ছিল না। স্কুলে একরাশ প াঠ্যসূচী, অঙ্ক, ফিজিক্স - কেমিস্ট্রি আর দু'-দুটিনতুন ভাষা ফরাসি আর জার্মান সামলে, কাঁদো-কাঁদো মুখে বাধ্যতামূলক ফুটবল খেলে - তার পরও মায়ের তাড়নায়বাংলা পড়তে বসা? বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের গল্প 'রাণুর প্রথম ভাগ'-- এর রাণুর মতো দশা হতো তাদের।বড়জন কানে শুনে যেটুকু মনে রাখতে পারতো সেটুকুই মনে রাখতো, লিপির সঙ্গে কে ানো সম্পর্ক রাখতে চাইতোনা। ছোটজন আরেকটু পড়ুয়া এবং আরেকটু বাধ্য ছিল, সে আমার সঙ্গে 'সহজ পাঠ'- এর দ্বিতীয় ভাগ পর্যন্ত পড়েছে। ওরবাংলা হাতের লেখাও ছিলো মুক্তোর মতো। তারপর যখন কলেজে পড়তে লণ্ডনে চ'লে গেলো, বাংলা পড়ার ছেদ পড়লো, তবে মধ্যে মধ্যে বলতো, এক বাংলাদেশি সহপাঠীর সহযোগিতায় বলার চর্চাটা বজ ায় রাখে। আমি জানি, আমার স্বামী যদি বাঙালি হতেন, তা হলে অন্তত বাড়িতে অনর্গল বাংলা বলাটা চালিয়ে যাওয়া যেত, কিন্তু স্বামীটিখোদ ইংরেজ, সে-সূত্রেই আমার দেশান্তর গ্রহণ, ছেলেদের স্কুলেও আর কোনো বাংলা-বলিয়ে ছিলো না, এবং অন্যান্য যাবতীয় কাজকর্মের পাশাপাশি তিনটি শিক্ষার্থীর ভাষাশিক্ষা একনাগাড়ে চালিয়ে যাওয়া আমার দ্বারা সম্ভবহয়নি।
বর্তমানে 'কম্যুনিটি'র ধারণা ব্রিটেন খুবই পোলিটিক্যাল গুত্ব অন্বিত ; বিভিন্ন গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে রক্ষা করা র াষ্ট্রের একটি দায়িত্বরূপে বিবেচিত হয়। সেই প্রেক্ষাপটে আমাদের মাতৃভাষা কিছুটা লাভবান হয়েছে। বাংলাকে আশ্রয় ক'রে যে-সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ, তার জন্য ছোট ছোট সরকারি খাতে কিছু কিছু সাহায্য আজকাল পাওয়া যায়, যা আম ার বিলেতবাসের প্রথম অথবা দ্বিতীয় পর্বে একেবারেই প্রাপণীয় ছিলো না।

এই ধরনের সহায়তা পেতে হলে কোনো একটা সংস্থার মাধ্যমে আর্জি পেশ করতে হয়-- এমন কোনো সংস্থা,'কম্যুনিটি'র ধারণার দিকে যার হেলন আছে। কর্তাদের যদি বোঝানো যায়, অমুক ত্রিয়াকলাপের দ্বারা একটি সংখ্যালঘু কম্যুনিটির স াংস্কৃতিক জীবন পুষ্ট হবে, তবেই মদত পাওয়া সম্ভব। যাঁরা বিচক্ষণ, যাঁদের পোলিটিকাল বুদ্ধি আছে, তাঁরা নিজেদের চ ারদিকে প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক উর্ণাজাল সৃষ্টি ক'রে নেন, এবং সেই জালের সহায়তায় অনুদান আকর্ষণ করেন।

এইভাবে এক-এক ঘাঁটিতে এক-একটি ছোট দলের প্রবর্তনায় বাংলাভিত্তিক ত্রিয়াকলাপ প্রবাহিত হয়। শেফিল্ডে বাংলাভ াষী মেয়েদের নিয়ে খেলার ওয়ার্কশপ চালান দেবযানী চট্টোপাধ্যায় আর সফুরান আরা। তাঁদের নিমন্ত্রণে একবার সেখ ানে গিয়েছি। তাঁরা দুজনে মিলে সাতজন বাঙালি মহিলার কবিতার একটি দ্বৈভাষিক সংকলন সম্পাদন করেছেন ; সেটি বার করেছেন শেফিল্ডের পাবলিক লাইব্রেরি। সেখানে তাঁরা আমার কয়েকটি বাংলা কবিতা নিয়েছেন, আমার স্বকৃত অনুবাদসহ। গ্রিম্‌স্‌বি শহরের ডাক্তার শিশির মজুমদার তাঁর অকালমৃতা স্ত্রী ডাক্তার স্বপ্না মজুমদারের স্মৃতিতে একটি স াংস্কৃতিক সংস্থা স্থাপন করেছেন। সেই সংস্থার তরফে তাঁরা রানীর অভিষেকের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে বহু সাংস্কৃতিক উৎসব করলেন নভেম্বর ২০০২-এ। এঁরা স্থানীয় সংস্থাদের জন্য বিশেষভাবে চিহ্নিত 'অ্যাওয়ার্ডস্‌ ফর অল্‌'--নামধেয় খাতে অনুদান পেয়েছেন। আমি তাঁদের উৎসবে যেতে পারি নি, কিন্তু তাঁরা তদুপলক্ষ্যে ইংরেজিতে যে-কবিতাসংকলন প্রকাশ করলেন, সেখানে একটি কবিতা দিয়েছি। উৎসব উপলক্ষ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ চ্যানেলে বাংলার পোষণ হচ্ছে। সুমনের একটি গানে আছে এই-জাতীয় কথা---রাজনীতি নাম কেন, রাজাদের দিন তো কবেই শেষ হয়েছে, লোকনীতি জন্ম নিক। তবে রানীর সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে রাজনীতি আর লোকনীতির আঁতাতসম্ভব হয়েছে। যতদূর জানি, 'টাগোর সেন্টার', 'স ম্পদ' ইত্যাদি সংস্থাকে অনুদান পেতে বিশেষ অসুবিধার মুখোমুখি হতেহয় না।

আমি নিজে কোনো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত নই। আমি কেবল একজন ব্যক্তি-কর্মী, ফ্রিলান্সার, লেখালেখি, অনুবাদ, গবেষণা যার কাজ। মাঝখানে প্রায় দশককাল নারীবিষয়ক গবেষণার একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে শিথিলভাবে যুক্ত ছিলাম, এখন সেখ ান থেকেও স'রে এসেছি। দেখলাম, সে -জগতেও পলিটিক্স চূড়ান্ত। আসলে সাহিত্যসৃষ্টির কাজটা তো একলার কাজ। অ ামাকে অনেকে বলেছেন, 'তোমাকে কোনো দলের সঙ্গে থাকতে হবে, তা হলে টাকাকড়ি পেতে সুবিধা হবে।' কিন্তু কতগুলে া কাজ দলের মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে করা যায় না। কতগুলো কাজ ওভাবে করা যায়-- যেগুলোর মধ্যে শিল্পকলার পরিবেশনের দিকটা আছে, যেমন পত্রিকা বা প্রকাশসংস্থা বা কবিতা ওয়ার্কশপ চালানো ,নাচ বা থিয়েটার বা ছোট মাপের অর্কেস্ট্রার পরিচালনা। কিন্তু যেখানে আপনি শুধুমাত্র লেখক, সেখানে আপনার নির্জনতা এবং স্বাধীনতার প্রয়োজন। বুদ্ধদেব বসু য াকে বলেছেন 'মায়াবী টেবিল', লেখকের সেই লেখার টেবিল কোনো দলের মেম্বারশিপ দিয়ে কেনা যায় না।

একটু আগে বললাম, বাংলার জন্য নতুন 'সাংস্কৃতিক স্পেস' আজকাল পাওয়া যাচ্ছে। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে এ ঘটনার কয়েকটি সদর্থক উদাহরণ দিই। ১৯৯৪ সালে আমার নাটক 'রাতের রোদ' মূল বাংলায় ব্রিটেনে অভিনীতহয় কলকাতার 'সংবর্ত' নাট্যগোষ্ঠীর প্রযোজনায়। ম্যান্‌চেস্টার নাট্যোৎসব তাঁদের নিমন্ত্রণ করেন, এবং সে-শহর ছাড়া আরও তিনটি শহরে অভিনয় হয়। এবং নিমন্ত্রণ সম্ভব হয়েছে কম্যুনিটির সূত্রে, সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর একজন নাট্যকারের কাজকে জায়গা দেবার উদ্দেশ্যে। কলকাতা থেকে একটি নাট্যদল এলেন, তাঁরা কলকাতায় খ্যাতনামা কোনো নাট্যকারের একটা নাটক করলেন, এ ঘটনার তাৎপর্য সেরকম নয়। নাট্যদলরা মাঝে - মধ্যে আসেন বৈকি, স্থানীয় নাট্যোৎসাহীরাও নিয়মিত বাংলা নাটক করেন--- সাধারণত অন্যদের রচিত নাটক। কিন্তু 'রাতের রোদ'-এর মঞ্চায়নের পিছনে ছিলো অন্য এক ধরনের স্ব ীকৃতি-- সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর একজন সমকালীন সাহিত্যিকের সর্বপ্রথম নাট্যরচনার স্বীকৃতি। 'রাতের রোদ' একটি দীর্ঘ মৌলিক নাটক, কোনো পাশ্চাত্য নাটক অবলম্বনে লেখা নয়। অভিবাসীবাঙালিদের আত্মপরিচয়ের প্রশ্ন এই নাটকের ডিসকোর্সের অন্তর্গত। যতদূর জানি, কলকাতার কোনো গ্রুপ থিয়েটারকর্তৃক একটি মৌলিক বাংলা নাটকের সর্বপ্রথম মঞ্চায়ন কলকাতায় না হয়ে 'বিদেশে' হয়েছে, এমনটা এর আগে হয় নি। ব্রিটেনে 'রাতের রোদ'-এর অভিনয় তাই অ

াধুনিক কালে বাংলার জঙ্গমতার একটি দৃষ্টান্ত। উল্টো পিঠে হয়তো এটাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ১৯৯৭-এ এই ন াটকের কলকাতার শোয়ের সময়ে 'সংবর্ত'কে কিছু স্পন্সরশিপ দিয়েছিলেন কলকাতার ব্রিটিশ কাউন্সিল। অর্থাৎ নাটকটা বাংলাতে হলেও নাট্যকার যেহেতু ব্রিট্রিশ নাগরিক,অতএব তাঁর কাজের মঞ্চায়ন 'বিদেশে' (কলকাতায়) ব্রিটিশ সরক ারের মদত পেতেই পারে, এটা তাঁরা স্বীকার করেছেন। আপনাদের 'ভিতর-বাইরে'র পরিপ্রেক্ষিতে আমি তাই যুগপৎ ভিতরের লোক এবং বাইরের লোক-- দুই দেশেরতাই-- এবং একটা ভাষাকে যদি তার 'স্বাভাবিক সীমানা' অতিক্রম করতে হয়, তা হলে বোধহয় এই ধরনের মানুষদের সক্রিয় ভূমিকা লাগে।

বাংলার জন্য নতুন সাংস্কৃতিক স্পেশের আরও দুটি উদাহরণ আমার ঝোলা থেকে দিই। খুব সম্প্রতি (মে ২০০৩) লীড্স্ শহরের বাঙালিদের একটি দল আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। তাঁরা একটি পাঠচক্র স্থাপন করেছেন। প্রথমে কলকাতা থেকে আমার কিছু বই তাঁরা আনিয়ে নিয়েছিলেন, তার পর আমাকে ডাকলেন। সেদিন বৃষ্টি পড়ছে অঝোরে, তবু একটি প াবলিক লাইব্রেরির এক কোণে কিছু লোক জড়ো হয়েছিলেন, ছাতা মাথায় দিয়ে অথবা গাড়িতে চেপে এসেছেন তাঁরা--- কেউ পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি, কেউ বাংলাদেশের বাঙালি। আমি বাংলাতেই বলেছি, কবিতাও পড়েছি, শ্রোতারা ভালে াবেসে এবং মন দিয়ে শুনেছেন। শ্রোতাদের মধ্যে একজন মেমসাহেব ছিলেন--- তিনি নাকি কলকাতায় গরিব ছেলেপুলেদের জন্য স্কুল চালানোর সঙ্গে যুক্ত আছেন। তাঁর সম্মানার্থে দু' -একটি ইংরেজি কবিতাও প'ড়ে দিলাম। উদ্যো ক্তাদের বিচারে অনুষ্ঠানটি '১০০ শতাংশ সফল' হলো--- তাঁদেরই ভাষা এটা। এঁরাও কিছু সরকারি অনুদান পেয়েছিলেন, তাই এ অনুষ্ঠান করতে পারলেন। বাংলার তরফে এওতাহলে একটি সফল লড়াই।

ব্রিটেনে এখন 'কেবল্','ডিজিটাল' এবংবিধ নতুন ধরনের টেলিভিশন চ্যানেল হয়েছে। আমার বিশ বছরের পুরোনো টিভি সেটে তাদের ধরতে পারি না, কিন্তু খবর পাই যে তারা চলছে। লন্ডনে বাংলা চ্যানেল হয়েছে কিছু দিন যাবৎ শুনছি। খুব সম্প্রতি তার জন্য ামার সাক্ষাৎকার নিয়ে গেলেন স্নেহভাজন ঊর্মি রহমান। সব কথাবার্তা বাংলাতেই বলা হলো। মতলব? 'লন্ডনের বাঙালিদের মধ্যে আপনার পরিচয়টা আরেকটু ছড়িয়ে দিতে চাই। অনেকে আপনারনামটা জানে, কিন্তু আর কিছু জানে না। তারা আপনার ঘরের পরিবেশটা দেখুক, দেখুক আপনি কিভাবে অক্সফোর্ডের শহরতলি কিডলিংটনে ব'সে বছরের পর বছর বাংলায় লিখে যাচ্ছেন।' উত্তম প্রস্তাব। বাধা দিতে যাবো কেন!

আমার ধারণা 'কম্যুনিটি'র গুত্ব স্বীকৃত হবার ফলে বাংলার তরফে কিচু ছোট ছোট লাভ অবশ্যই হয়েছে, বংলার মর্যদাও কিছুটা বেড়েছে। সংখ্যালঘু গোষ্ঠীগুলির ভিতরে যে কিছু কিছু প্রকৃত সাহিত্যিক রয়েছেন, যাঁরা গণমাধ্যমে দৃশ্যমান না হলেও যে-যার মাতৃভাষায় লিখে যাচ্ছেন এবং স্বভূমি থেকে বইপত্র বার করেছেন, এটা আর কেউ অস্বীকার করতে পারেন না। 'আমি বাংলার লেখক, খোঁজ, নিয়ে দেখুন, কেউ আমার নাম শুনেছে' --- এ কথা বললে অন্যান্য লেখক, বা আর্টস্ কাউন্সিলের লোক, কেউ আর অবাক হবেন না। বরং কিছুলোক এখন খোলাখুলি স্বীকার করেন যে আমাদের মতো সা হিত্যিকদের কাজ ইংরেজিতে তর্জমা হয়ে মূলধারায় পরিবেশিত হওয়া দরকার। 'লোকে জানুক যে আপনারা আছেন', এই চিন্তার বশবর্তী হয়ে লন্ডনের একটি অভিজাত পত্রিকা, 'মর্ডান পোয়েট্রি ইন ট্রান্স্লেশন', ২০০১ সালে একটি বিশেষ সংকলন বার করেছেন সেইসব বহিরাগত কবিদের রচনা নিয়ে, যাঁরা ইংল্যান্ডে থাকেন কিন্তু মাতৃভাষায় লিখে চলেছেন। এখানে তাঁরা আমার তিনটি বাংলা কবিতার স্বকৃত অনুবাদ নিয়েছেন, এবং লিখিয়ে নিয়েছেন একটি প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ, দশকরে পর দশক একটি দেশে থেকে সেখানে অদৃশ্য শব্দশিল্পী হয়ে জীবনযাপন করা কী ধরনের অভিজ্ঞতা। এই সংকলনেন বহু 'অদৃশ্য কবি'র চেহারা দেখে আমি নিজেও আশান্বিত এবং প্রফুল্ল বোধ করেছিলাম; ব্যক্তি হিসেবে বিচ্ছিন্ন অবশথায় পথ চললেও আমাদের চারপাশে নানা জাতির নানা সহযাত্রী রয়েছেন, তাঁরও আমাদের সঙ্গে আছেন, পথ চলছেন, নিজেদের মাতৃভাষায় লিখে যাচ্ছেন--এটা ভরসা দেয় বৈকি।

এরই সঙ্গে জড়িয়ে আছে আরেকটি নতুন স্রোতের চিন্তা---যেসব সাহিত্যকর্ম সংখ্যালঘু কম্যুনিটিগুলির নিজস্ব বিদগ্ধগে

াত্রীয় উত্তরাধিকার, তাঁদের 'ক্লাসিক্স্', সেই ধরনের কাজেরও অনুবাদ হওয়া প্রায়োজন, যাতে অন্যরা সনত্ত করতে পারি কী এই সব বহিরাগত শিল্পীদের প্রকৃত উত্তরাধিকা। কী সম্পদ তাঁরা স্মৃতিতে আর শিক্ষার সূত্র তাঁদের রত্তে বয়ে এনেছেন, কী ধরনের টেক্সট্ তাঁদের মনকে গঠন করেছে, সেটা না বুঝলে অন্যান্য নাগরিকরা এঁদেরর প্রকৃতপরিচয় পাবেন নাষ এঁদের মুখের আদল চিনবেন না। এই খাতে শুভেচ্ছা যতটা আছে অর্থ সাহায্য ততটা নেই, তবুশুভেচ্ছাটুকু বহুমূল্য, এবং চিন্তা যে একটা বাঁক নিয়েছে সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ষাটের দশকে কেউ কেউ অমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন, আমার মাতৃভাষায় কোনো উল্লেখযোগ্য সাহিত্য আছে কিনা। বিগত ষোলো-সতেরো বছরধ'রে---র‍্যাডিচির প্রথম অনুবাদগুচ্ছ বার হবার পর থেকে--- ত্রমে ত্রমে রবীন্দ্রনাথের নাম আবার দৃশ্যমান, তাঁর গুত্ব স্বীকৃত, তাঁর রচনার নতুন অনুবাদগুলি তাঁকে কিছু নতুন পাঠক জুটিয়ে দিয়েছে। টাগোর সেন্টারের মতো প্রতিষ্ঠানের প্রচার থেকেও জিজ্ঞাসুদের চোখে রবীন্দ্রনাথের মুখের আদল উজ্জ্বলতর হয়। বলা দরকার, আমার নিজের রবীন্দ্র-অনুবাদকর্মের জন্য সামান্য হলেও ক্ষুদ্র একটি সরকারি অনুদান এ দেশে আমি পেয়েছিলাম। তারপর যখন বুদ্ধদেব বসুর কবিতা অনুবাদ করেছি, তখন সেই প্রজেক্টের জন্য আমার পুরোনো অক্সফোর্ডীয় কলেজের প্রাত্তন ছাত্রীদের একটি সংস্থার কাছ থেকে অনুরূপ একটি ক্ষুদ্র অনুদান পেয়েছি। ছোট ছোট ঘটনা হলেও এগুলো তাৎপর্যময়, সাহিত্যের বাহন হিসেবে বাংলা ভাষার নতুন মর্যাদার সূচক। এ ধরনের অনূদিত সাহিত্যের পাতা ওল্টালে যাঁরাসুধী ব্যত্তি, তাঁরা সরজমিনে যাচাই করতে পারেন যে আমরা কোনো ফ্যালনা ঐতিহ্য থেকে আসি নি, আমাদের পায়ের নিচে দাঁড়াবার জন্য একটা শত্ত জমি আছে। আমাদের পরবর্তী কাজের জন্য সাহায্য বা প্রচার পাওয়া আরেকটু সুকরর হয়। সাহিত্যিক কর্মী হিসেবে আমাদের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রথম ধাপ থেকে প্রমাণ করতে হয় না।

প্রতিবন্ধক এখনও আছে বৈকি, এবং এবার সে - সম্বন্ধে একটু বলি। অনুবাদের কাজে এগারোবার জন্য অল্পস্বল্প মদত পাওয়া আগেকার চাইতে সহজতের হয়ে এসেছে, যেটা কিনা ফ্রিলান্সার লেখকদের পক্ষে--- যাঁদের লেখা ছাড়া রোজগারের অন্য কোনো উৎব নেই--একটা লাভ। তবু সেই কাজ শেষ হয়ে গেলে অনূদিত কর্মের জন্য প্রকাশক জোটানো এখনও খুব কঠিন কাজ। যাঁরা অনুদান দেন, তাঁরা অনুদান দিয়ে খালাস, সম্পন্ন কাজের জন্য অনুবাদককেই খোঁজাখুঁজি ক'রে প্রকাশক জোগার ক'রে নিতে হয়। সাধারণভাবে বলতে গেলে, ইংরেজির বিশ্বায়িত প্রসার ও প্রচার অনূদিত সাহিত্য প্রকাশের ব্যাপারে ইঙ্গ-মার্কিন দুয়িার প্রকাশকদের অননীহাকে তীব্রতর ক'রে তুলছে। ভারতীয় সাহিত্য থেকে ইংরেজি অনুবাদের বাজার ভারতের ভিতরেই বেশি বাড়ছে, তার বাইরে ততটা নয়। ভারতের ভিতরেবাড়ছে, সেটাও সুখের কথা, তবে বইগুলো তো বাইরেও পাঠানো দরকার। কিন্তু ভারতীয় প্রকাশকরা বৈদেশিকবিতরণে তেমন পটু নন, গন্ডগোল সেখানেই। বাংলাসমেত ভারতীয় ভাষাগুলির সীমানা-অতিত্রমকারী চলিষ্ণুতা বাড়াতে হলে অনুদিত সাহিত্যের বৈদেশিক বিলিব্যবস্থা আরও অনেক জোরদার করা দরকার।

এদিকে বাংলার সীমাননার বাইরে দাঁড়িয়ে বাংলার মাধ্যমে মৌলিক কাজ করার কতগুলো অসুবিধা রয়েই গেছে। বাংলার মাধ্যমে একটা বড় প্রজেক্ট আরম্ভ করার জন্য বিলেতের আর্ট্স্ কাউন্সিল অথবা ব্রিটিশ অ্যাকাডেমির মতো প্রতিষ্ঠানের মদত পাওয়া এখনও সম্ভব নয়। ভবিষ্যতে হতেও পারে, কিন্তু আপাতত ঠিক এই জায়গাটায় 'কম্যুনিটি' স্তরের বহুসাংস্কৃতিক মৌসুমি বায়ু বিশেষ কোনো বর্ষণ দিতে অপারগ। এই সানুদেশে বাংলা ভাষার লেখক বিট্রেনের নাগরিক হলেও দ্বিতীয় শ্রেনীর নাগরিক। আপনার কাজটা যত উচচমার্গীয় হবে, ভাষাশিল্পের যত ভিতরমহলে প্রবেশ করবে, তত আপনাকে সত্যিকারের প্ল্যাটফর্মের জন্য কলকাতা বা ঢাকার প্রকাশ এবং সম্পাদকদের সঙ্গে যোগ রাখতে হবে। চত্রাকার তর্কে মদত-দেনেওয়ালাদের এইটেও একটা যুত্তি, যে-বই কলকাতা বা ঢাকা থেকে, অর্থাৎ 'বাইরে থেকে' প্রকাশিত হবে, সেখানে বিদেশি প্রকাশককে মদত দেবার প্রশ্নও এসে পড়ে। বিদেশি প্রকাশকের পোষণ তাঁরা কেন করবেন, করবেন না। যে-বইয়ের প্রধান বাজার তাঁদের বিচারে 'বাইরে', ব্রিটেনের ভিতরে নয়, এখানকার কোনো 'কম্যুনিটি'-মুখো নয়, তেমন বইয়ের প্রকাশের জন্য তাঁরা অর্থসাহায্য বরাদ্দ করবেন না; লন্ডনস্থ মার্কিন প্রকাশকদের দপ্তরগুলিও কোনো প্রকাশসংত্রান্ত সরকারি অনুদানের জন্য দরখাস্ত করতে পারে না। এইসব হিশেবনিকেশের ন্যায় আমরা সকলেই বুঝি, সব আমলাত

ান্ত্রকেই কিছু নিয়মকানুনের অভ্যন্তরে কাজ করতে হয়, তবে এর পরিণামে মার খেতে হয় সংখ্যালঘু গোষ্ঠির ব্যক্তি-লেখককে, লেখাই যাঁর জীবন, এবং যিনি মাতৃভাষায় লিখতে চান। ইংরেজিতে লিখতে একটা বড় বই লেখার জন্য এমন অনুদান পাওয়া সম্ভব, যাতে এক বছর কেবল লেখায় আত্মনিয়োগ করা যায়, অন্য কোনো আয় না করলেও চলে। সালমান শদি এরকম একটি অনুদান পেয়েছিলেন। আর অধ্যাপকদের জন্য রয়েছে স্যাবাটিকালের ব্যবস্থা, যখন তাঁরা অধ্যাপনা থেকে এক বছরের জন্য অবসর নিতে পারেন--- পুরো বেতন! কিন্তু প্রস্তাবিত বইটা যদি বাংলায় হয়, আপনার আবেদন তো এগোবেই না! হ্যাঁ, এগোতে পারে হয়তো, যদি কোনো ক্ষমতাশালী রেফারী আপনাকে একটা ধাক্কা দিয়ে এগিয়ে দেন, কিন্তু তেমন পৃষ্ঠপোষকের দেখা আমি অন্তত পাই নি। আর এ দেশের স্যাবাটিকাল-পাওয়া অধ্যাপক বইখানা ইংরেজিতেই লিখবেন-- অন্য কোনো ভাষায় নয়। তাই কার্যত দেখতে পাই, কম্যুনিটির দোহাই পেড়ে একাধিক ব্যক্তির ভালো-মন্দ-মাঝারি লেখা দিয়ে ভরিয়ে মুদ্রণপ্রমাদে বোঝাই, ণত্ব-ষত্ব-না-মানা দু' -চারটে বারোয়ারি বাংলা সংকলন ব্রিটেন থেকে বার করা যেতে পারে, কিন্তু একক লেখকের সিরিয়াস কবিতা - উপন্যাস - নাটক - গবেষণা ছাপতে হলে বাংলা ভাষার ডায়াস্পোরিক সাহিত্যিককে সেই কলকাতা বা ঢাকার মুদ্রণ এবং বিতরণব্যবস্থার মুখের দিকে তাকাতে হবে, তার বিকল্প এখনও গ'ড়ে ওঠে নি। 'রাতের রোদ' না-হয় বিলেতে মঞ্চস্থ হলো, কিন্তু ছাপবেন কে? কেন, কলকাতার সুধাংশুশেখর। দে! আর এই অবস্থাটা কেবলই উপনাহাদেশের ভাষার লেখকের নয়। পৃথিবীর নানা ভাষার অজস্র লেখকলেখিকা ব্রিটেনে থাকেন--- কেউ কেউ, আমার মতো ব্যক্তিগত কারণে, কেউ কেউ জীবিকাসূত্রে, কেউ কেউ রাজনৈতিক কারণে স্বদেশ থেকে নির্বাসিত বা ছিন্নমূল হয়ে এ দেশে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। এখানকার সরকার উদারমনস্ক বহুসাংস্কৃতিকতাকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করলেও কার্যে তাকে রূপায়িত করা অত সহজ নাকি? যারা প্রকৃত উদ্বাস্তু,গৃহহারা, নির্যাতিত, তাদের পুনর্বাসনেই যখন দম বেরিয়ে যায়, দেশের স্কুল আর হাসপাতালগুলো চালাতেই বা গৃহহীনদের আবাসন যোগাতেই যখন সরকার হিমসিম খেয়ে যায়, তখন বহিরাগত শিল্পীদের পোষণের জন্য টাকাবার করবে কোন্ দপ্তর? তাই ব্রিটেনবাসী শ - চেক-হাঙ্গেরীয়-হিস্পানী-সোমালী-আরবী-তূর্কী-ফার্সী-চীন-জাপান ইত্যাদি বহুসংখ্যক ভাষার প্রথম শ্রেণীর লেখকুলের একই অবস্থা। আমরা সবাই এক নৌকায়।

সাহিত্য হলো একটা ভাষার বিদগ্ধতম প্রকাশ ও প্রয়োগ। কেজন চিত্রশিল্পী মুখের ভাষার পরোয়া না ক'রে দিনের পর দিন প্রবাসে থেকে ছবি এঁকে যেতে পারেন, একটু নামডাক হয়ে গেলে ভালোমতন প্রদর্শনীও করতে পারেন; একজন সুরকার, বাজনদার, গাইয়ে বা নাচিয়েও ঐভাবে কাজ ক'রে যেতে পারেন, ছোটবড় অনুষ্ঠানে তাঁর কাজ পরিবেশন করতে পারেন, কিন্তু প্রবাসী বা অভিবাসী লিখিয়ের অবস্থাটা অন্য জাতের, তাঁর ভাগ্যটা তাঁর লেখার ভাষার সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে জড়িত। ইংরেজির রথযাত্রায় যোগ দিলে পৃথিবীর যে-কোনো কোণ থেকে ঋিয়িত বাজার পাওয়া সম্ভব হতে পারে, কিন্তু আপনি যদি বলেন, 'আমি একটা বছর আর কিছু করবো না, কেবল বাংলায় একটা উপন্যাস লিখবো,' কিংবা 'বাংলায় একটা বৃহৎ বই লেখার জন্য আগামী পাঁচ বছর গবেষণা করবো', তা হলে আপনি যেখানেই থাকুন আপনার জীবনসংগ্রাম অন্য জাতের। সেই দিক দিয়ে দেখলে 'কম্যুনিটি'র কেতাদুরস্ত ধারণাটির মধ্যে ব্রিটেনে অভিবাসী বাংলা ভাষার লেখকের জন্য কোনো স্বয়ংত্রিয় ত্রাণ নেই, বরং ওখানে কিছু সমস্যা আছে।

'কম্যুনিটি'র ধারণাটি যত গণতান্ত্রিরক হোক, তা উভবল। ডায়াস্পোরার লেখকের পক্ষে তা একাধারে অনুকূল এবং প্রতিকূল। ব্রিটিশ সাংস্কৃতিক কর্মী হয়তো ব'লে দিলেন, 'কী আশর্চ্য, আপনার কম্যুনিটি আপনার জন্য কিস্সু করে না কেন? তাররার তো আপনাকে আপনার কাজের জন্য অনুদান বা স্পন্সরশিপ দিতে পারে। বাঙালি ব্যবসায়ীদের সংস্থা নেই?' হায় কপাল, লন্ডনের বাঙালিরা গাঁটের করিড় ফেলে বাংলা বইই কিনতে চান না, তাঁরা দেবেন স্পন্সরশিপ? পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরা সাধারণ ডাক্তার, শিক্ষক, চাকুরে, সাংবাদিক ইত্যাদি-- সাদা কলারের কর্মী। বাঙালি ব্যবসায়ী বলতে আছেন বাংলাদেশী রেস্তোরাঁগুলোর মালিকবৃন্দ। থাঁরা হয়তো বাংলাদেশী শিল্পীকে স্পন্সর করবেন, কিন্তু কলকাতার লোককে ? লন্ডনে পশ্চিমবঙ্গ - বনাম-বাংলাদেশী পলিটিক্স নেই ভেবেছেন?

বাংলা ভাষার একজন অভিবাসী লেখকে পক্ষে তাঁর ভাষাভাষী অভিবাসী গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্ক আবশ্যিকভাবে জটিল, এমন কি, কিছুটা দ্বান্দ্বিক। তাঁর তথাকথিত কম্যুনিটি তো তোঁ কাজের গুণগ্রাহী না-ও হতে পারে! এখানে সংখ্যাগত একট া ব্যাপার আছে। স্বদেশে তাঁর কম্যুনিটি পরিমাণের দিক দিয়ে একটা বৃহত্তর ব্যাপার। ধন লোকটি কবি। ঠিক, সকলেই কবিতা ভালোবাসেন না, কিন্তু দেশে থাকলে কবিবরের মেরেকেটে একশো পাঠক জুটে যাবে। বাইরে এলে তা জুটবে না। দশজন জুটলে তিনি অশেষ ভাগ্যবান। এর বেশি আশাও করা যায় না। কেননা তাঁর গোষ্ঠীর অনেক অভিবাসী মুনুষই বিদেশে এসেছেন ভাগ্য ফেরাতে, উন্নততর ঐহিক জীবনের অন্বেষণে, শিল্পচর্চার মতলব নিয়ে নয়। জীবিকা অর্জন এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত রাখা তাঁদের প্রধান লক্ষ্য। অধিকাংশের কাছে সাংস্কৃতিক জীবন অবসরের বিনোদন, জীবনের কেন্দ্র নয়। তাই অধিকাংশ অনুষ্ঠানেই বিনোদনের ভাগ বেশি থাকে, মননের ভাগ অনেক কম থাকে। নৃত্যগীতের অনুষ্ঠানে প্রেক্ষ াগৃহ ভ'রে যাবে, কিন্তু কবিতাপাঠের আসরে সেরকম ভিড় হবে না। এরকমই হয় সর্বত্র-- কলকাতার বইমেলার ভিড় বই কেনার বদলে তেলে-ভাজা কিনতে ব্যস্ত থাকতে পারে-- তবে আপন দেশের জমিতে কম্যুনিটির বৃহত্তর শরীর ফাঁকটা ভ'রে দেয়। অন্য জমিতে ফাঁকটা প্রকট হয়ে ওঠে। একজন ভাবুক-শিল্পীর নিজস্ব নিন্তন, শিল্পের জন্য তাঁর সংগ্রাম, তাঁর আশ ানৈরাশ্য, নিঃসঙ্গতা, আনন্দবেদনা, ট্রাজেডিচেতনা, আদর্শবাদ, গড্ডলিকাপ্রবাহ থেকে বিযুক্তি, শিল্পের মাধ্যমের প্রতি তন্ময় মনোযোগ-- এগুলি তাঁকে তাঁর অভিবাসী কমুনিটির অন্যান্য সভ্যদের থেকে একটু তফাতে রাখবেই। এঁরা হয়তো চ ান জীবনটাকে গুছিয়ে নিতে, পালিশ দিয়ে ঝকঝকে ক'রে নিতে ; তিনি খোঁজেন সান্নিধ্য এবং রসগ্রাহিতা, আবার সৃষ্টির নির্জনতাও। তাঁর মধ্যে কিছুটা খ্যাপামি না থাকলে তো তিনি শিল্পী হতেন না। অপিচ তিনি চান প্রায়োজবোধে থাঁর আপন কম্যুনিটিকে সমালোচনা করবার পূর্ণ স্বাধীনতা। এদিকে অভিবাসী কমুনিটি স্বাভে স্পর্শকাত--- সমালোচনা গ্রাহণের উদ ারতা তাঁদের নাও থাকতে পারে।

বাংলার অবস্থান একটু অন্যরকম হতো যদি অভিবাসী গোষ্ঠী আরও বাংলা বই কিনতেন, যদি ব্রিটেনের মতো জায়গায় ব াংলা বইয়ের কেটা স্বতন্ত্র বাজার গ'ড়ে উঠতো। তা ঠিক হয় নি। কলকাতার প্রকাশকরা কয়েক বছর বই বিক্রির চেষ্টা ক'রে আশানুরূপ ফল না পেয়ে আর এখানে বইমেলা করতে আসছেন না। কম্যুনিটি গ্রন্থাগারিকরা, 'রূপসী বাংলা'র মতো বাংর্লাদেশী পুস্তকবিক্রেতারা বলেন যে লাইব্রেরিতে বাংলা বই কেনা হলেও তা ইস্যু হয় না, দোকানে বই প'ড়ে থ াকে।

বই কেনার ব্যাপারে বিলেতের বাঙালিরা একটু কৃপণ। তাঁরা যে-টাকা দিয়ে বিনা দ্বিধায় এক গেলাস বিয়ার আর এক প্য াকেট বাদাম কিনবেন, সেই টাকা দিয়ে একটা বই কিনতে ইতস্তত করবেন। তাঁরা কেবল হিসেব কষতে থাকবেন, কলকাতয় গেলে বইটা আরও কত সস্তায় কেনা যেতো। একটা বই এক দেশ থেকে অন্য দেশে ডাকযোগে আনাতে কিংবা বইয়ের দে াকান চালাতে যে কিছু খরচ পড়ে, সেই কথাটা তাঁরা মানতে চান না। যেন। তাঁরা আশা করেন যে কলকাতার বই অলৌকিক পাকা আমের মতো বিট্রেনে তাঁদের ত্রোড়া খ'সে পড়বে। অনেক ভেবেচিন্তে তাঁরা হয়তো মোলায়েম স্বরে বলবেন, 'এখন থাক, সামনের বছর কলকাতায় গিয়ে বইমেলা থেকে কিনে স্যুকেসে ভ'রে নিয়ে আসবো।' এই কম্যুনিটি কী ক'রে একজন সিরিয়াস লেখককে কোনো বড় স্পন্সরশিপ দেবে ? কমুনিটির অধিকাংশ সভ্যের মানসতা চাকুরিজীবীর।

বাংলা বইয়ের কোনো প্রকৃত 'বাজার' যে ব্রিটেনে ঠিক গ'ড়ে ওঠে নি, তার একটা বড় কারণ পরবর্তী প্রজন্ম বাংলা বলেন কম, পড়েন আরও কম। পাঠকগোষ্ঠী এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে প্রলম্বিত হলে তবেই তো হৃষ্টপুষ্ট বইয়ের বাজার গ'ড়ে উঠবে। বাংলা ভাষার আসল ধারকবাহক হলেন আগন্তুক প্রথম প্রজন্ম। খেপে খেপে এসে প্রথম আগন্তুকরাই ভাষাটাকে সচল রাখেন। তাঁদে ছেলেমেয়েরা ভাষাটকে সেভাবে ধ'রে রাখতে পারেন না। তাঁরা হয়তোবাংলা গান গাইতে পারেন, কত্থক নাচ নাচতে পারেন, কেউ কেউ বাংলায় সহজ ভূমিকায় অভিনয়ও করতে পারেন, কিন্তু খুব কম ছেলেমেয়েকে মূল ব াংলায় সাহিত্যের পাঠক বলা যায়। সেই অর্থে আমাদের সরস সজল ভাষার সচলতা একটা পাথুরে সীমায় এসে ঠোক্কর খেয়ে ঠেকে যায়। তাই ছবিটা মিশ্র, স্রোত আর প্রতিস্রোতে মেশানো।

সামনে এগিয়ে চলা দিকটির মধ্যে পাশ্চাত্য জগতে বাংলার চর্চা আজকাতল উন্নত প্রযুক্তির কাছ থেকে যে অতিরিক্ত মদত পাচ্ছে সেটা উল্লেখের যোগ্য। কম্পিউটারে লেখা, ওয়েবসাইট তৈরি করা, ইন্টারনেটভিত্তিক পত্রিকা চালানো--- এইসব ক্রিয়াকালাপে ভাবী কালের জন্য আশায় ইঙ্গিত আছে. আমার লেখক-ওয়েবসাইট থেকে যোগাযোগের ঠিকানা পেয়ে অ ামার সঙ্গে ই-মেইলে যোগাযোগ করেছেন অনেকে। বাংলায় ই-মেইল বিনিময় এখনও ব্যাপক হয় নি, তরে পি-ডি-এফ অ্য াটাচমেন্ট বাংলা পাঠানো কঠিন নয়। বিনিময়ের মাধ্যম ইংরেজি হলেও ই-মেইলের কল্যাণে ভাবনাবিনিময়কারী বাঙা লিদের দুনিয়াজোড়া জালবন্ধন একটু একটু ক'রে গ'ড়ে উঠেছে টের পাই। ই-মেইলের মাধ্যমে বাংলাদেশ দু' -একজন করিতকর্মা সম্পাদকও ইন্টারনেট ক্যাফে থেকে তাগাদা দিতে শিখে গেছেন। এ দেশে এখন আমরা স্থানীয় সম্পাদকদের লেখা পাঠাতে পারি ই-মেই অ্যাটাচমেন্টে। কলকাতায় বড় সম্পাদকেরাও এখনও তার জন্য প্রস্তুত নন। দিল্লির অক্সফোর্ড ইউনির্ভার্সিটি প্রেসে আমার বুদ্ধদেব - অনুবাদের পুরো বই ই-মেইল অ্যাটাচমেন্ট হিসেবে পাঠানো হয়েছে; অবশ্য পেপ ার কপিও গেছে। বাংলা বইয়ের ক্ষেত্রে তা হতে এখনও দেরি আছে, তবে আমি নিজে বেশ কয়েক বছর দ'রেই কলকাতার প্রকাশকদের জন্য 'ক্যামেরা-রেডি কপি' তৈরি ক'রে পাঠাচ্ছি। যতদূর জানি, গোলাম মুরশিদও তাঁর বইয়ের 'ক্যামেরা-রেডি কপি' তৈরি ক'রে পঠিয়ে থাকেন। প্রকাশকরা যেহেতু প্রুফ পাঠাতে চান না, -- খরচ আছে, তাই তা ছাড়া ডাকের য াওয়া - আসা আজকাল আর নির্ভরযোগ্য নয়,--অগত্যা এটা একটা সমাধান, প্রযুক্তি যা সম্ভব করছে।

প্রযুক্তির কথা যখন এসে পড়েছে, তখন মার্কিন দুনিয়ার কথা একটু ব'লে নেওয়া যাক। ওখানে আমি থাকি না, তাই ওখানে বাংলার অবস্থা ঠিক কিরকম সে-সম্বন্ধে আমার কোনো ব্যাপক নির্ভরযোগ্য বীক্ষা নেই। তবে ওখানকার বাঙালিদের মেলা এবং সম্মেলনগুলিতে নিমন্ত্রিত হয়ে অংশগ্রহণ করতে গিয়েছি বার - পাঁচেক। উত্তর আমেরিকা উদ্যেগগুলি সুবৃহৎ এবং জাঁকজমকে পুরপূর্ণ--- এরকম যজ্ঞশালার মতো ব্যাপার ব্রিটেনে ঘটে না। সেসব জমায়েতে সামাজিক মেলামেশা, স াংস্কৃতিক উৎসব, বৌদ্ধিক আদানপ্রদান বাণিজ্য-- সবই কিছু কিছু থাকে দেখতে পাই। যেসব মেলায় শাড়ির কেনাবেচা থ াকে সেখানে বই-ক্যাসেটের কেনাবেচাও থাকে, এবং কিছু আলোচনা সভার ব্যবসাথাও থাকে। শুনতে পাই বিপুল আয়ে াজনের অন্তরালে যখন প্রস্তুতিপর্ব চলে, তখন ছোট ছোট দলের তিক্ত পলিটিক্স তার মধ্যে ঢুকে পড়ে গণ্ডগোল বাধায়; বাঙ ালিদের এই স্বভাব বোধহয় সংশোধনের অতীত। তবে এইসব উৎসব বাংলার মর্যাদাকে যে খানিক মদত দেয়, অংশগ্রহণকারীদের আত্মচেতনা এবং আত্মসম্মানবোধকে পুষ্ট করে। তা অস্বীকার করা যায় না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর ক্য ানাডার বাঙালিরা রোজগার করেন বেশি; বই কেনার র‍্যাপারে তাঁরা ব্রিটেনের বাঙালিদের চাইতে অনেক বেশি উদার। বক্তৃতা বা কবিতাপাঠের সময়ে টেবিলে বই রাখলে সব বিক্রি হয়ে যায়, একটি কপিও বাকি থাকে না। আসর থেকে কোনো বই ফেরত আনতে হয় না। আদানপ্রদানে প্রযুক্তির প্রয়োগে এবং নিজেদের কম্যুনিটির জন্য উন্নত মানের পত্রিকা প্রকাশেও তাঁরা আগ্রণী। ক্যানাডার 'বাংলা ডর্নাল' এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়েব পত্রিকা 'পরবাস' দুটি উল্লেখযোগ্য এবং প্রশংসনীয় উদ্যেগ। ব্রিটেনের অনুরূপ উচচমানের কোনো পত্রিকা আচে বলে আমার জানা নেই, থাকলে তাঁরা আমার সঙ্গে কখনো যোগাযোগ করেন নি। ওই মাহাদেশের বাঙালিদের ওপরে প্রযুক্তির অভিষাতেরস একটি উল্লেখযোগ্য ফল হলো। ই-মেলই-ভিত্তিক যুক্তিবাদী চিন্তাবিনিময়ের বৃত্তগুলি। মনে হয়, বাংলাদেশের বাঙালিরা এ ব্যাপরে আগ্রণী, তবে বৃত্তগুলির ভিতরে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বেং অবাঙালিরাও থাকেন, জাতপাতটা মুখ্য ব্যাপার নয়। সারা পৃতিবী থেকে তাঁরা বার্তা পাঠান, জালবন্ধনটা দুনিয়াজোড়া। স্বাধীন মতপ্রকাশে, ধর্মীয় টেক্সটের খোলাখুলি সমালোচনায়, ধর্মভিত্তিক নিপীড়নের বিদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনে, ধর্মভিত্তিক রাজনীতির মুখোশ উন্মোচনে, উপমহাদেশের সর্বত্র ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অবস্থা সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য জরিপ প্রকাশে এঁরা এক দুর্মুল্য ভূমিকা পালন করছেন। উপমহাদেশের এমন অনেক ঘটান, য াদের খবর পাশ্চাত্য গণমাধ্যমে সহজলাভ্য নয়, এঁরা বৃত্তের সভ্যদের কাছে পৌঁছে দেন। যেসব কথা বাংলাদেশে, পাকিস্ত ানে, হয়তো বা ভারতেও খোলাখুলি আলোচনা করা সম্ভব নয়, সেগুলি প্রকাশ্যে আলোচিত হতে পারে। নানাভাবে এই উদ্যোগুলিকে আমার বৈপ্লবিক মনে হয়েছে। আমি এদের মধ্যে উপমহাদেশের জন্য এবং ভাঙা পরস্পরকে বুঝতে হয়, তবে মধ্যে মধ্যে রোমান হরফে বাংলা বাক্য থাকে, এবং মধ্যে মধ্যে বাংলা পি-ডি-এফ ফাইল জুড়ে দেওয়া হয়।

নিউ ইয়র্কের সাপ্তাহিক 'ঠিকানা' একটি বহুপ্রচারিত বড় আকারের খবরের কাগজ। তাছাড়া আছে ছোট ছোট নানা উদ্যোগ, যেমন তণ প্রজন্মকে বাংলা শিখতে উদ্বুদ্ধ করার ব্যাপারে দায়বদ্ধ 'আমরা' পত্রিকা, যা ক্যানাটা থেকে বেরোয়-- আশা করি এখনও বেরোয়। প্রসঙ্গত বলি যে উত্তর আমেরিকার অভিবাসী বাঙালিদের সন্তানদের মুখে যে-বাংলা শুনেছি, তাকে আমরা ব্রিটেনের দ্বিতীয় প্রজন্মের মৌখিক বাংলার চাইতে সচলতার মনে হয়েছে।

এই ফাঁকে স্বভূমির বাইরে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি আর বাংলাদেশের বাঙালি, এই দুই পক্ষের সমঝোতা সম্পর্কে দু-চার কথা বলে নেওয়া যায়। পলিটিক্স এবং রেষারেষি অবশ্যই আছে, তাদের স্রোত - প্রতিস্রোত আমি টের পাই। আবা দরকারমতো দু'পক্ষে হাত মিলিয়ে কাজ করেন না এমন নয়। আমার ধারণা দু'পক্ষকে সব থেকে বেশি মেলাতে পারে গানের আসর। কোনো নাম-করা গাইয়ে এলে-- তা তিনি যেদিকেরই হোন না কেন-- হল ভরে যাবে। তবে কোন্ পক্ষ বাংলাকে বেশি ভালোবাসেন, তার জন্য বেশি করেন, এমন তর্ক যদিও মাঝে - মধ্যে কানে আসে, আমার নিজের তাকে অবান্তর মনে হয়।

আমি ব্রিটেনে আছি নবরাষ্ট্র বাংলাদেশ নির্মাণের আগে থেকে। সেকালে পূর্বপাকিস্তানের অধিকাংশ আগন্তুক ছিলেনশ্রীহট্ট জেলার, তাঁরা রেস্তোরাঁ খুলে জীবিকানির্বাহ করতেন। একাত্তরের পর আরও নানারকমের ছিন্নমূল পূর্ববঙ্গীয় মানুষ এখানে এসেছেন, তাঁদের মধ্যে সবরকমের পেশার মানুষ রয়েছেন, তবু এখনও রেস্তোরাঁ বিজনেসের সিলেটীরাই দল সব থেকে ভারী। এঁরা 'মৌখিক সাংস্কৃতি'র মানুষ। বাংলাদেশ সৃষ্টির পর এঁদের যথেষ্ট 'আত্মপরিচয়-সংকট' ঘটে। এঁরা কি বাঙালি, না সিলেটী, এবঁদের মাতৃভাষা কি বাংলা, না সিলেটী, সিলেটীকে কি বাংলার উপভাষা বালা যাবে, অথবা তা কি স্বতন্ত্র ভাষা, স্বতন্ত্র লিপি বা লিখিত সাহিত্য না থাকলেও--- এইসব সূক্ষ্ম প্রশ্ন এঁদের রীতিমতো আন্দোলিত করে। আন্দোলনের প্রকৃত লক্ষ্যসে সিলেটী কম্যুনিটির জন্য ক্ষমতার ভিতকে দৃঢ় করা, তা বুঝতে বেগ পেতে হয় না। স্কুলের কম্যুনিটি পলিটিক্সে বাংলা-বনাম সিলেটী যথেষ্ট তিক্ততা সৃষ্টি করে। শিশুদের ক্ষেত্রে ঢাকার বাংলার বদলে সিলেটীর ব্যবহাররের জন্য সিলেটীরা লড়াই করেন। ঢাকা - রাজশাহী বাঙালিদের সঙ্গেই যাঁদেরলড়াই, ভারতের বাঙালিদের সঙ্গে তাঁরা যে কিছুটা দূরত্ব বজায় রাখা পছন্দ করবেন, তা প্রত্যাশিত। কম্যুনিটির এইঅংশটির মধ্যে ধর্মের গোঁড়ামি, নারীদের বোরখা-ধারণ, নারীস্বধীনতার প্রতি তীব্র প্রতিরোধের মনোভাব--সবই প্রত্যাশিতভাবে বর্তমান। অপর পক্ষে উত্তর আমেরিকার বাংলাদেশীর মধ্যে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সংখ্যা অনেক বেশি। তাই বৈপ্লবিক যে সম্ভবনাগুলির কথা একটু আগে বললাম সেগুলি সম্ভব হয়েছে, বেং ১১ই সেপ্টেম্বরের ঘটনাগুলিরপরে তথা উপমহাদেশের বর্ধমান সাম্প্রদায়িক আশান্তির পটভূমিকায় এই চেতনা এবং দূরদৃষ্টি জোরদার হয়েছে।

বাংলাদেশের অভিবাসী বাঙালিরা পশ্চিমবঙ্গীয়দের চাইতে বাংলাকে বেশি ভালোবাসেন, তার জন্য বেশি করেন, এমন দাবি আমার নিজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমি করতে পারি না। বাংলাদেশ তৈরি হওয়ার পরে বাংলাকে ভালোবাসার একটা জোয়ার এসেছিলো বটে, তার ঢেউ আমরা পেতাম, কিন্তু সম্প্রতি আরও কিছু কিছু পরিবর্তন এসেছে। কলকাতয় যেমন মধ্যবিত্তেদের ছেলেমেয়েরা আজকাল ইংরেজিপাগল, ইংরেজি ছাড়া কথা কয় না, শুনতে পাই ঢোকাতেও তেমন একটি শ্রেণীর অভ্যুদয় ঘটেছে। সেদিন লীড্‌সে একজন আমাকে বললেন, ওখানে তিন শ্রেণীর মানুষ দেখা যায় উচচবিত্ত, যারা ইংরেজি দ্বারা আবিষ্ট; এক শ্রেণীর শ্রমজীবী, যাদের মধ্যে বিহারী উর্দুর যথেষ্ট প্রচলন আছে; আর মাঝখানে আছেন বাংলাভাষীরা। ধর্মীয় গোঁড়ামির প্রসার বাড়ছে; এ জিনিস যত বাড়বে বাংলা নিজস্ব জোর এবং মর্যাদা তত কমবে। সাম্প্রতিক খবর এই যে, ঢাকা বিমানবন্দরের নাম এখন আরবি লিপিতেও জ্বলজ্বল করছে।

এ অনুষঙ্গে আরকেটি কথা আমি অনেকবার ভেবেছি। পূর্ববঙ্গের ভাষা-আন্দোলনকে আমরা সঙ্গত কারণেই সম্মান জানাই, কিন্তু বাংলার জন্য পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরাও যে কম লড়েন নি, সেটা আমরা ভুলে থাকি কেন, যথেষ্ট স্বীকার করি না

কেন ? কেন আমাদের এই হীনম্মন্যতা? নিজেকে দিয়ে তো আমি একটা ব্যাপার বুঝতে পারি। অভিবাসী হলেও বাংলায় সাহিত্যিক হওয়া সম্ভব, বাংলার সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করা সম্ভব-- আমার এই ধারণাগুলো ঐতরি হলো কিভাবে, প্ররণা এবং মদত পেলাম কোত্থেকে ? উত্তর স্পষ্ট--- আমার ধ্যানধারণার বনিয়াদ তৈরি হয় পঞ্চাশের দশকের কলকাত ায়। তখন রবীন্দ্রপরবর্তী লেখকরা কলকাতায় উজ্জ্বলভাবে সক্রিয়। বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা' পত্রিকা আমরা নিয়মিত পড়ছি। রাজশেখর বসু তখনও বেঁচে। 'অনুরোধের আসরে'-এ বাংলা গানের জমজমাট মেলা। শম্ভু মিত্রর 'রক্তকরবী' দেখতে ছুটিছি আমরা। সিনেমাশিল্পী হিসেবে উঠে এলেন সত্যিজিৎ রায়, বাংলা ভাষাকে পৌঁছে দিলেল কত কত বিদেশীর কানে। এই যুগটার শিক্ষা থেকেই তো আমি বাংলা ভাষার ডায়াস্পোরিক লেখিকাহতে পেরেছি। বাংলায় আর সংস্কৃতে কলকাতর যে-পুঁজি নিয়ে আমি কুড়ি বছর বয়সে বিদেশে এসেছিলাম, তাকে সুদে-আসেলে খাটিয়ে তো বাংলায় লিখে যা চ্ছি আজও। সেই বনিয়াদ তো নড়বড়ে ছিলো না, যথেষ্টই মজবুত ছিলো। আমার বাংলাকে সবল রাখতে পেরেছি তারই জোরে, ভূল বানান দেখলে চিনতে পারি বেং দূরের প্রকাশকদেরজন্য বইয়ের ক্যামেরারেডি কপি তৈরি করতে পারি তারই প্রসাদে। আমি জানি মাতৃভাষায় লেখার প্রতি দায়বদ্ধতার ব্যাপারে বুদ্ধদেব বসু এবং তাঁর প্রজন্মের সাহিত্যিকদের কাচে আমি কতটা ঋণী। সম্প্রতি বুদ্ধদেবের কবিতা- অনুবাদের সূত্রে তাঁর একটি প্রবন্ধও অনুবাদ করলাম। প্রকাশকরা বললেন, পরিশিষ্ট হিসেবে তাঁর একটি বিতর্কমূল প্রবন্ধ দিলে কেমন হয়। আমি বেছে নিলাম তাঁর ১৯৫৭-র শক্তিশালী প্রবন্ধ 'ভাষা, কবিতা ও মনুষ্যত্ব', সরকারী ভাষা - কমিশনের বিবৃতির বিদ্ধে তাঁর তীব্র প্রতিবাদ। কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন রাজ্যের ওপর হিন্দি চাপিয়ে দেবার বিদ্ধে তীব্রতম প্রতিবাদ করেছেন তিনি, এবং সাহিত্যের বাহন হিসেবে মাতৃভাষাকে দিয়েছেন সর্বোচচ অ াসন। অথচ যখন ভাষা নিয়ে কথা হয়, কই তাঁর নাম তো কেউ উচচারণ করেন না।

এ প্রসঙ্গে আরও বলি, মাতৃভাষাকে যদিও ভালোবাসি, তবু ভাষাভিত্তিক কোনো সংকীর্ণ গোষ্ঠীবদ্ধতায় বা কুনো জাতীয়ত াবাদে আমার মন সাড়া দেয় না। আমার মতে সেদিকে এগোলে বিপদ আছে। বুদ্ধদেবের মাতৃভাষাপ্রীতিকে আশেষ শ্রদ্ধা করি এই কারণেই যে তা ঝিনাগরিকতার খোলা থালায় একটি উপাদন। আজকের পৃথিবীতে বিভিন্ন গোষ্ঠীর, বিভিন্ন ভাষ ার মানুষকে গা ঘেঁষে পাশাপাশি বাস করতে হয়, তাই পরস্পরকে শ্রদ্ধা করতে এবং হাত মিলিয়ে কাজ করতে শিখতে হবে। যাঁরা ডায়াস্পোরার বাঙালি, তাঁরা যেন বাংলার মধ্যে পৃথিবীকে টেনে আনেন, আর বাংলাকে পৌঁছে দেন পৃথিবীর কাছে, তাঁদের ঝিনাগরিকতা দিয়ে বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যকে তাঁরা যেন সমৃদ্ধ করেন, এটাই আমার কাম্য। গণ্ডি-আঁকা আলাদা-আলাদা এলাকায় থাকার ফর্ম্যুলা নয়, সহাবস্থানের সূত্রগুলোই আমাদের আয়ত্ব করতে হবে। আমি যখন ব্রিটেনে ইংরেজদের আসরে কবিতাপাঠ করি, হাত দেওয়া সময় একেবারে ন্যূনতম না হলে চেষ্টা করি মূল বাংলায় একটা অন্তত কবিতা পড়তে, যাতে তাঁরা ধবনিটা কানে গ্রহণ করতে পারেন, এবং সর্বদা শুনতে পাই, কী শ্রুতিনন্দন আমাদের ভ াষা। শ্রোতার অনুরোধও করবেন বাংলায় কিছু শোনাতে। তেমনি কলকাতায় শান্তিনিমকেতনে চেষ্টা করি ইংরেজিতেও স্ব রচিত দু' -একটা কবিতা পড়তে, কেননা এটাও আমার কাছে অদ্ভূত লাগে যে আজকের দিনে ওখানে ভারতীয়দের ইংরেজি গদ্যকে নিয়ে আদিখ্যেতার অন্ত নেই, অথচ যে-শহরে আমার প্রজন্মের ইংরেজি-পড়ুয়াদের ডি. এইচ. লরেন্স, টি. এস. এলিয়ট, বা অডেন-স্পেণ্ডারে হাতে - খড়ি হয়েছে, সেখানে আধুনিক ইংরেজি কবিতার চর্চা কিরকম বিবর্ণ।

আরও একটা চেষ্টা আমি করে গেছি, বিলেতে বাস করেও বাংলাকে ভালোবেসে, তার চর্চা করে, তার মঙ্গলের জন্যএবং ভবিষ্যতের চলার পথের জন্য গভীরভাবে চিন্তা করে, এইরকম কিছু চরিত্র উপন্যাসে তৈরি করতে। একটু খেয়াল করলে দেখবেন যে আমার উপন্যাসের নোটন বা অনামিকা। ঐরকম, নাটকের শিখা বা ডি, বিবি বা দেয়া,ইলা বা লিপি, সুপর্ণা বা রেখা ঐরকম। ঐ জাতের চরিত্রদের রূপ দিতে আমার ভালো লাগে। বাস্তবতাকে লঙঘন নাকরেও সৃষ্ট চরিত্রদের অঙ্গে মুখমণ্ডলে সাংলাপেস্রষ্টার অন্তরের স্বপ্নদের চারিয়ে দেওয়া যায়, এটা আমি ঝিাস করি। একটা ভাষায় যারা কথা বলে, ভ াবে, লেখা, বই পড়ে, তাদের জীবন তো একমাত্রিক, অকিঞ্চন নয়। বাস্তবে যাপিত জীবন যেমন আছে, তেমনি আছে কল্পন ায় দৃষ্ট জীবন, সম্ভব হলেও হতে পারে এরকম জীবন। এই অন্য মাত্রাটাকে স্বপ্ন দিয়ে, কবিতা দিয়ে স্পর্শ করা যায়, পায়ের বুড়ো আঙুলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে উঁচু জিনিস ছুঁয়ে ফেলার মতো। এই অন্য মাত্রার স্বাদ এনে দেওয়াও তো সাহিত্যিকের দ

ায়িত্ব। 'রাতের রোদ' নাটকে ভাষাবিষয়ক ডিসকোর্সআছেরীতিমতো। অভিনয়কালে, এমন কি রিহার্সাল চলার সময় থেকেই, ভাষবিষায়ক সংলাপগুলি কিছুটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। কিছু উদাহরণ তুলে দিচ্ছি।
জরায়ু-নিষ্কাশন। কিংবা জরায়ু -কর্তনও বলতে পারেন। যা আপনার অভিচি। ... বাংলা নেই। তাই আমরা একটা প্রতিশব্দ তৈরি করেছি।

জীবনের কতগুলো এলাকাকে, যেখানে নানারকমের স্পষ্ট আর সূক্ষ্ম মানে দরকার, আমরা ইংরেজি শব্দের খুঁটির বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখছি। আর বাংলার জন্য রেখে দিচ্ছি কেবল মোটা জিনিসগুলো মাথা দপ্‌দপ্‌ করছে, পা চুলকাচ্ছে, গা গুলাচ্ছে-- ... কিন্তু ভাষা কি কেবল রান্নাবান্না, মান- অভিমান আর গানেনর জন্য ? তা কি জ্ঞানের জন্যও নয়, অধ্যাপক ?
কিন্তু আমার প্রশ্ন এগুলো (তিনটি বিশেষ ইংরেজি শব্দ) বাংলায় ঢোকার আগে বাঙালিরা কি কখনো কোনো ইন্ট্রেস্টিং বা ইম্পর্টান্ট বা সিরিয়াস কাজ করে নি ? করে থাকলে শব্দগুলো গেলো কোথায় ?

অভিকাকা, আমি একটা অত্যন্ত ইন্ট্রেস্টিং, ইম্পর্টান্ট এবং সিরিয়াস বিষয়ের দিকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। মেয়েদের জীবনের একটা গুত্রপূর্ণ ঘটনার কোনো ভদ্র বাংলা নাম নেই--- ... মেনোপজ্‌। মেনোপজের বাংলা নেই। ... কী আশর্চ্য! ইংরেজরা ভারতবর্ষে আসার আগে ভারতবর্ষের মহিলাদের কি মেনোপজ্‌ হতো না ? আমরা কি কেউ কল্পনা করতে পারি য়ে আমাদের মা-মাসিরা পরস্পরের সঙ্গে আলেচনা করছেন (ন্যাকা-ন্যাকা গলায়) 'এই, তোর আর্তবক্ষয় হয়ে গেছে?' ঐরকম শব্দ জন্ম থেকেই মৃত।

বেশ মনে পড়ে, সংলাপের এইসব টুকরো মঞ্চে উচচারিত হওয়ার সময়ে দর্শকরা কেমন নড়ে-চড়ে বসতেন, প্রেক্ষাগৃহে কেমন একটা চাপা হাসির স্রোত বয়ে যেতো। পরে ফিডব্যাকও পেয়েছি কিছু-কিছু। কেউ কেউ 'মেনোপজ্‌'-এর বাংলা প্রতিশব্দ সরবরাহ করেছেন। যেমন 'রজোনিবৃত্তি'। কিন্তু এটাও নাটকে উল্লিখিত 'আর্তবক্ষয়'-এর মতো একটা আধুনিক ব ানানো শব্দ। কেবল পারিভাষিক শব্দের তালিকাতেই তাকে পাওয়া যাবে। আমার এক বোন আমেরিকায় থাকেন। তিনি বললেন, তিনি দেশে পরিচায়িকাদের মুখে তথা বিজ্ঞাপনে 'ঋতুবন্ধ' বা সংক্ষেপে 'বন্ধ' শব্দটা শুনেছেন। হরতাল-অর্থক 'বন্‌ধ' আর মেয়েদের বন্ধে গুলিয়ে গেলে তো বড় ঝামেলা ! কিন্তু আমার প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে'রজোনিবৃত্তি' বা 'ঋতুবন্ধ'র মতো শব্দ তা হলে বাংলা অভিধান নেই কেন? এমন কি, আমার সংস্কৃত অভিধানেও তো তাদের পাইনি। তাকলে তো অন্তত সংস্কৃত অভিধানে থাকা উচিত ছিলো। আমার কাছে চারটে বাংলা অভিধান আছে। জ্ঞানেন্দ্রমোহন, রাজশেখর বসু, হরিচরণ, সংসদ---কেউ মূল অভিধানে কোনো শব্দ দেননি। 'রাজোনিবৃত্তি' বা 'ঋতুবন্ধ' স্পষ্টত সংস্কৃতঘেঁষা। সংস্কৃততে ঐ জাতের শব্দ থেকে থাকলে হরিচরণের মতো সংস্কৃতজ্ঞ তাদের স্বীকার করেন না কেন?

বোন বললেন, মুখের ভাষাকে স্বীকার করতে অভিজাত পণ্ডিতদের হয়তো আপত্তি আছে। আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু সংস্কৃতির পণ্ডিতদের তো শুচিবায়ু ছিলো না। রাজোদর্শন আর ঋতু-উদয়কে নিয়ে ভাষার কম খেলা নেই। উর্বরতার সূচনা শব্দকে াষে অজ্ঞ নামে স্বীকৃতি পেয়েছে, মূল্যান্বিত - সমাদৃত হয়েছে। কিন্তু তার অবসান কোনো নাম পায়নি,সেটাকে স্বীকার করতে তাঁরা দ্বিধান্বিত। এই কথাটাই তো আমার নাটকের চরিত্ররা বলছে! যারা অনেক দিন আগে ভারতের বাইরে চলে এসেছে, যারা পশ্চিমের দেশেই বড় হচ্ছে, তারা কী করে জনাবে গাঁয়ের মেয়েরা, পরিচারিকারা কী নামে জাকে ঘটনাট াকে? আমি নিজেই তো আমার মায়ের মুখে কোনো শব্দ শুনিনি, 'মেনোপজ্‌'ই শুনেছি।আভিধানিক স্বীকৃতি তাই বাইরের বাঙালিদের ভাষাচর্চায় গুত্বপূর্ণ হতে বাধ্য। ঠিক যেমন আমরা যখন ও দেশে থেকে ইংরেজি শিখেছি, বারবার অভিধান খুলতে হয়েছে আমাদের। আমরা তখন জানিনি ব্রিটেনের গাঁয়ে-গঞ্জে লোকে কিভাবে কথা বলে, শহরের বস্তির খিস্তি কিরকম হয়, কাকে বলে স্কটিশ বা ওয়েল্‌শ্‌ অ্যাক্‌সেন্ট।

তাছাড়া ঋতু চক্রের শেষ তো কোনো ছোট গেঁয়ো ঘটনা নয়, নারীজীবনের পরিপ্রেক্ষিতে একটা সর্বজনীন গটনা। মেয়েরা কিছুদিন বেঁচে থাকলে এ ঘটনা ঘটবেই। এমন একটা ঘটনার কোনো আভিধানিক নাম না থাকা আমাদের মানসতা সম্বন্ধে অবশ্যই কিছু বলে, আমাদের বুদ্ধিজীবীদের মানসিক অভ্যাসের অপূর্ণতা এবং সীমিাবমদ্ধতাকেই তুলে ধরে। সেটাই আম ার চরিত্ররা বোঝার চেষ্টা করছে। দূর থেকে দেখতেল আপন গোষ্ঠীরই অন্য একটা চেহারা ধরা পড়ে। বিজয়া মুখোপাধ্য ায় আমাকে বলেছিলেন, 'রাতের রোদ' নাটকে ভাষাবিষয়ক যে-চিন্তাস্রোত আছে, সেটা নিয়ে আরও আলোচনা হওয়া উচিত। খেয়াল কন, আমি বাইরে থাকি বলেই আমাদের ভাষা সম্পর্কে ওভাবে লিখতে পারলাম। একটা জিনিস আমাকে বেশ ভাবিয়েছে, এবং কৌতুকও সরবহারহ করেছে 'রাতের রোদ'--এর সততসঞ্চরমান নারীবাদ প্রেক্ষাগৃহে হাসির তরঙ্গ তুললেও তা নিয়ে সেরকম কোনো আলোচনা আমি কলকাতার বাংলাকাগজপত্রে শুনিনি, নারীবাদ সম্পর্কে অ াধুমিকতম আলোচনাগুলোতেও কোথাও নাটকটার নামমোল্লেখ দেখি না, অথচ কী আশর্চ্য, নাটকটা যে-মুহূত্যে তর্জমা করলাম অমনি পাশ্চাত্য দেশের একটি বিবিদ্যালয় তাকে নারীবাদী সেক্সট্ হিসেবে পাঠ্য করলো। অর্থাৎ তাঁরা নারীবীদী বক্তব্যগুলোকে চিনতে পারলেন, তাদের গুত্ব বুঝলেন। একটা বাতাঁকে কে কিভাবে নেবে, বুদ্ধি দিয়ে কতটা নেবে তার অ াবেগ দিয়ে কতটা নেবে, বার্দাটির কোন অংশ একবার শুনে অবচেতনেই ছেঁটে ফেলবে, কোন অংশ নিয়ে প্রকাশ্যে একশোব ার হৈচৈ করবে, এসব আগে থেকে বলা যায় না। ভিন্নি ভিন্ন অবস্থানে ভিন্ন ভিন্ন দেখার আলোয় তার ভিন্ন ভিন্ন রূপ ঝলসে ওঠে। ভাষা এবং সাহিত্যের সীমানা-অতিত্রমকারী জঙ্গমতা তাই খুব দামী

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com